

আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য বিকাশে ড. নাজিব আল- কিলানী- এর অবদান
(Contribution of Dr. Najib Al-Kilani to the development of Islamic literature
in Arabic Language)



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
নূরুজ্জাহান
এম.ফিল গবেষক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আবদুল কাদির
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা - ১০০০।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য বিকাশে ড. নাজিব আল- কিলানী- এর অবদান
(Contribution of Dr. Najib Al-Kilani to the development of Islamic literature
in Arabic Language)



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

নূরুজ্জাহ

এম.ফিল গবেষক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

রেজিঃ নং - ১০

শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আবদুল কাদির

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা - ১০০০।

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল গবেষক নূরুজ্জাহ (রেজিঃ নং- ১০; শিক্ষাবর্ষঃ ২০২১-২০২২) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত “আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য বিকাশে ড. নাজিব আল- কিলানী-এর অবদান” শীর্ষক গবেষণাটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে ইতোপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি অভিসন্দর্ভটির আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

ড. মোঃ আবদুল কাদির
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য বিকাশে ড. নাজিব আল- কিলানী-এর অবদান” শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম।

গবেষক

(নূরুজ্জাহ)

রেজি: নং -১০

শিক্ষাবর্ষ: ২০২১-২০২২

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি, যার একান্ত মেহেরবানীতে অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে উপস্থাপনের উপযুক্ত করে নিতে সক্ষম হয়েছি ‘আলহামদুলিল্লাহ’। দরুদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মহান শিক্ষক, কালজয়ী আদর্শ, সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি, যিনি মূলতঃ মানব জাতির জন্য সত্য জ্ঞানের সন্ধান নিয়ে এসেছিলেন। আর মানুষকে জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি, যারা আমাকে “আরবি ভাষায় ইসলামি সাহিত্য বিকাশে ড. নাজিব আল- কিলানী-এর অবদান” শীর্ষক গবেষণাটি সম্পাদনে সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক, অত্র গবেষণাকর্মের সম্মানীত তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ আবদুল কাদির স্যারের প্রতি যার সুনিপুণ নির্দেশনা ও আন্তরিক পরামর্শ আমার এ গবেষণা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি উস্তাযুল আসাতিয়া, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী স্যারের প্রতি, শিরোনাম ঠিক করা সহ গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যার জ্ঞানগর্ভ নির্দেশনা ছিল আমার অন্যতম পাথেয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরবী বিভাগের সম্মানীত চেয়ারম্যান ও অধ্যাপক ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক স্যার, অধ্যাপক ড. মুহাঃ মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ রফিকুল ইসলাম স্যারসহ আরবী বিভাগের স্যারদের প্রতি, যাদের বিভিন্ন সময়ে দেয়া মূল্যবান পরামর্শ গবেষণাকর্মটি সুন্দরভাবে শেষ করতে আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার আব্বা-আম্মাসহ পরিবারের সদস্যদের প্রতি যাদের সহযোগিতা ও ঐকান্তিক দোয়া আমার কাজকে মহান রব অনেক সহজ করে দিয়েছেন, বিশেষত প্রিয় সহধর্মিনীর প্রতি যে নিজের কঠিন সময়েও তার ধৈর্য্য ও সহযোগিতা দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্তে কাজে মনোযোগী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি ইমরান মাহমুদ, সাঈদ হাসানসহ সে সব প্রিয় অনুজ ও অগ্রজদের যারা অনেক বেশি পেরেশানি নিয়ে এ গবেষণা কাজের স্বার্থে আমার যে কোন প্রয়োজনে আন্তরিক সাড়া দিয়ে পাশে থেকেছে, তাদের মূল্যবান সময় ও শ্রম ব্যয় করেছে। আল্লাহর কাছে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান কামনা করছি। আল্লাহ সকলকে তাদের সহযোগিতার জন্য উভয় জগতে কল্যাণ দান করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট একান্ত প্রার্থনা, তিনি যেন এ গবেষণাকর্মটি জ্ঞানপিপাসুদের জন্য কল্যাণকর পাথেয় হিসেবে কবুল পূর্বক পরকালে কঠিন সময়ে আমার জন্য মুক্তির উসিলা হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন।।

আরবী-বাংলা প্রতিবর্ণায়নে অনুসৃত নীতিমালা

এ অভিসন্দর্ভে নিম্নোক্ত ছকে বর্ণিত নিয়মানুসারে আরবী বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বহুল প্রসিদ্ধ শব্দাবলির ক্ষেত্রে প্রচলিত বানান ঠিক রাখা হয়েছে। যেমন, ‘আরবী’ শব্দটির প্রথম অক্ষর ع (আইন) হলেও বর্ণিত নিয়মে আ’রবী (উর্ধ্বকমা যোগে) লেখা হয়নি।

বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ	বর্ণ	প্রতিবর্ণ
أ/إ/ئ/ؤ	আ	ز	য	ق	ক, কু
ب	ব	س	স	ك	ক
ت	ত	ش	শ	ل	ল
ث	ছ,স	ص	স	م	ম
ج	জ/য	ض	দ,দ্ব	ن	ন
ح	হ	ط	ত,ত্ব	و	ভ,ওয়া
خ	খ	ظ	য	ه	হ
د	দ	ع	উর্ধ্ব কমা’	ي	য়
ذ	য	غ	গ, ঘ		
ر	র	ف	ফ		

সংকেত পরিচিতি

কুরআন	: প্রথম সূরার নাম, দ্বিতীয় আয়াত সংখ্যা
(সা:)	: সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(আ:)	: আলাইহিস সালাম
(রা:)	: রদ্বিআল্লাহু আনহু/আনহা (আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন)
(রহ:)	: রহমাতুল্লাহি আলাইহি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)
হি.	: হিজরী সন
খৃ.	: খৃষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	: খৃষ্টপূর্ব
বাং	: বাংলা সন
ইং	: ইংরেজি সন
তা. বি.	: তারিখ ও সনবিহীন
ই.ফা.বা	: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রাগুক্ত	: পূর্বোল্লিখিত/ পূর্বোক্ত
খ.	: খন্ড
পৃ.	: পৃষ্ঠা সংখ্যা
দ্র.	: দ্রষ্টব্য
মৃ.	: মৃত্যুসন
ড.	: ডক্টর
নং.	: নম্বর
Dr.	: Doctor
Ibid	: Ibidem (in the same place)
P.	: Page
P. P.	: Pages
Vol.	: Volume

গবেষণা অভিসন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানবজীবনের ব্যক্তিগত, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সব দিককে সমন্বিতভাবে পরিচালিত করে। এই জীবনব্যবস্থার মৌলিক আদর্শ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মানবসমাজে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে যে সব মাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, তার মধ্যে সাহিত্য অন্যতম। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও জীবনদর্শন গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। সেই প্রেক্ষাপটে ইসলামী সাহিত্য মানবজীবনের নৈতিক পরিশুদ্ধি, বিশ্বাসগত দৃঢ়তা ও সমাজ সংস্কারের একটি শক্তিশালী বাহন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। আরবী ভাষা ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের বাহক হওয়ায় ইসলামী সাহিত্য বিকাশে আরবী সাহিত্যের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী সাহিত্য মানবজীবনের নৈতিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামী সাহিত্য কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে ভিত্তি করে গঠিত, যা মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামী সাহিত্য মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সততা, ধৈর্য ও পরোপকারের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে। এটি ইতিহাস, কাব্য, গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে ইসলামের মূল্যবোধ প্রচার করে। সাহাবা, ওলি-আউলিয়া ও ইসলামী মনীষীদের জীবনী ইসলামী সাহিত্যের অংশ, যা আদর্শ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা জোগায়।

এই সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক যুগে এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করে, যা মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক।

প্রাচীন আরবী সাহিত্য মূলত গোত্র-কেন্দ্রিক জীবনচেতনা, বীরত্বগাথা, বংশগৌরব ও যুদ্ধবর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আবির্ভাবের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে একটি মৌলিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। কুরআনুল কারীমের অলৌকিক ভাষাশৈলী এবং ইসলামী বিশ্বাস ও নৈতিকতার প্রভাবে

সাহিত্যের বিষয়বস্তু, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল রূপান্তর ঘটে। সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের সাহিত্যিকদের রচনায় আল্লাহভীতি, আখিরাতে বিশ্বাস, মানবিক মূল্যবোধ ও ন্যায়পরায়ণতার ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। এভাবেই ইসলামী ভাবধারা আরবী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় উমাইয়া, আব্বাসী, আন্দালুসীয় ও উসমানী যুগ অতিক্রম করে আরবী সাহিত্য বহুমাত্রিক বিকাশ লাভ করে। আধুনিক যুগে এসে সামাজিক পরিবর্তন, উপনিবেশবাদ, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব এবং চিন্তাগত দ্বন্দ্ব আরবী সাহিত্যে নতুন বিষয় ও রূপের আবির্ভাব ঘটায়। একই সঙ্গে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক সাহিত্যও নতুন আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক আরবী ইসলামী সাহিত্যে ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি বাস্তব সমাজচিত্র, সংগ্রামী চেতনা, নৈতিক সংকট ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব গভীরভাবে আলোচিত হতে থাকে।

এই আধুনিক আরবী ইসলামী সাহিত্যধারার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি হলেন ড. নাজিব আল-কিলানী। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও আদর্শনিষ্ঠ লেখক হিসেবে পরিচিত। রচনাগুলো ইসলামি আদর্শ, সামাজিক বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক চেতনার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা রয়েছে, যা কেবল শিল্পের অনুশীলন নয়, বরং ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আল-কিলানির সাহিত্য বাস্তবধর্মী এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। তার রচনাগুলো সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট এবং ঈমানের পরীক্ষাকে গভীরভাবে উপস্থাপন করে। তিনি মুসলিম সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সংকটকে তুলে ধরেছেন, যা পাঠকের চিন্তা ও চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে। তার রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী মূল্যবোধের প্রাধান্য। তিনি মানব চরিত্রের আত্মশুদ্ধি, ন্যায়বিচার, ঈমানের শক্তি এবং ইসলামের সামাজিক আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তার সাহিত্য পাঠকের নৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে।

তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ন করেননি, বরং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তার রচনায়

ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো শিল্পিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যকর্মে ইসলামী বিশ্বাস, মানবিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজ সংস্কারের স্পষ্ট আহ্বান পরিলক্ষিত হয়। তিনি সাহিত্যকে নিছক সৌন্দর্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং আদর্শ প্রচার ও মানবমুক্তির একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর রচনায় ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, আত্মিক শূন্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা লক্ষ করা যায়।

ড. নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে ইসলামী আদর্শ ও চেতনা বহুমাত্রিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর লেখায় ঈমান, তাকওয়া, ন্যায়বিচার, আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণের ধারণা সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত। তিনি সমাজের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের কণ্ঠস্বরকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন এবং অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানসিকতা জাগ্রত করার প্রয়াস চালিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁর সাহিত্য পাশ্চাত্য সভ্যতার নৈতিক সংকট ও আদর্শিক দেউলিয়াত্বের বিপরীতে ইসলামী জীবনদর্শনকে একটি বাস্তবসম্মত ও মানবকল্যাণমুখী বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

আলোচ্য গবেষণায় ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় ও ঐতিহাসিক বিকাশধারার আলোকে আধুনিক আরবি সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ড. নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত ইসলামী আদর্শ, দাওয়াতী চেতনা, নৈতিক সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যিক ভাষাশৈলী, বিষয়বস্তুর গভীরতা ও আদর্শিক দৃঢ়তা আধুনিক আরবী ইসলামী সাহিত্যে তাঁকে একটি স্বতন্ত্র ও মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে।

মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্য নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আধুনিক সাহিত্যিকরা তাঁর রচনাগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন।

বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম উম্মাহ যখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার, তখন নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আদর্শ রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর সাহিত্য শুধু ইতিহাস নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ পথচলার দিকনির্দেশক। তাঁর সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয়, সামাজিক

সংস্কার, রাজনৈতিক মুক্তি, এবং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের এক অনন্য দলিল। তাঁর রচনা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় উপাদান।

বর্তমান সময়ে আরবী সাহিত্য পাঠ ও একাডেমিক গবেষণায় ইসলামী সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত বা সীমিতভাবে আলোচিত হয়। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরবি সাহিত্যের বিস্তৃত পরিসরের তুলনায় ইসলামী সাহিত্যের আলোচনা তুলনামূলকভাবে কম। এই গবেষণা সেই ঘাটতি পূরণের একটি প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর মাধ্যমে আধুনিক আরবী ইসলামী সাহিত্যে ড. নাজিব আল-কিলানীর অবদান ও গুরুত্ব নতুনভাবে অনুধাবনের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং আরবী সাহিত্য অধ্যয়নে ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

সূচীপত্র

ভূমিকা	৩
প্রথম অধ্যায়: ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়	৬
প্রথম পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের পরিচয়	৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়	১০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী সাহিত্যের উপাদান	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিকাশধারা	১৭
প্রথম পরিচ্ছেদ: আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা	১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী যুগ	২৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: উমাইয়া যুগ	৩২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: আব্বাসী যুগ	৩৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: আন্দালুসীয় যুগ	৪৬
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: উসমানী যুগ	৫০
তৃতীয় অধ্যায়: আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ	৫২
প্রথম পরিচ্ছেদ: আরবী সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা	৫৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আধুনিক আরবী সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি	৫৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার	৬৩
চতুর্থ অধ্যায়: ড. নাজিব আল কিলানীর পরিচয় ও সাহিত্যকর্ম	৭৩
প্রথম পরিচ্ছেদ: জন্ম ও বংশ পরিচয়	৭৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: শিক্ষাজীবন	৭৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: কর্মজীবন	৭৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সাহিত্য সাধনা	৮১
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম	৮৪
পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামী সাহিত্যে ড. নাজিব আল কিলানীর অবদান	৮৯
প্রথম পরিচ্ছেদ: ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ ও চেতনাবোধ	৯০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত ও নৈতিক আদর্শের প্রসার	৯৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যকর্ম	১০১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সামাজিক অবক্ষয় রোধে ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যকর্ম	১০৯
পঞ্চম পরিচ্ছেদ: সাহিত্যে সংগ্রামী চেতনার প্রসার	১১২
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে ইসলামী আদর্শের প্রসার	১১৬
ষষ্ঠ অধ্যায়: বিশ্ব-সাহিত্যক্ষেত্রে ড. নাজিব আল কিলানীর অবস্থান	১২০
প্রথম পরিচ্ছেদ: ড. নাজিব আল কিলানী ও সমসাময়িক ইসলামী সাহিত্যিকদের মাঝে তার অবস্থান	১২১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে ড. নাজিব আল কিলানী	১৪৯
উপসংহার	১৫২
গ্রন্থপঞ্জী	১৫৫

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি ইসলামকে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দরুদ ও সালাম মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রতি যিনি ইসলামের আলোকে মানবজীবনের পরিপূর্ণ পথনির্দেশনা দিয়ে গেছেন।

ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থার নাম। মানুষ ইহ ও পরকালীন উভয় ক্ষেত্রে যে সব প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হবে, সেগুলোর নিখুঁত সমাধান হিসেবেই আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে মানবজাতির জন্য নিয়ামত হিসেবে দান করেছেন। সে আলোকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর যুগ থেকে শুরু করে আজ অবধি মানুষ ইসলামের ছায়াতলে এসে কল্যাণময় জীবনের স্বাদ অনুভব করছে।

সাহিত্য শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আর ইসলাম মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ জীবনমুখী শিক্ষা বিধায় সাহিত্যেও ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও নির্দেশনা বিরাজমান। আরবী পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলোর একটি। এর সাহিত্যভাণ্ডারও অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত। আরবী সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে এর বিস্তৃত জগত অজানা নয়। তবে এর পরিধি নির্ণয় দুঃসাধ্য। মানুষের জীবনের সব দিককেই সাহিত্য অন্তর্ভুক্ত করে।

তবে, আরবী সাহিত্য মানেই ইসলামী সাহিত্য নয়। বরং পৃথিবীর তাবৎ ভাষার মত জীবন-ঘনিষ্ঠ নানা দিক নিয়ে আরবী সাহিত্যে লেখনীর পরিমাণও অপরিমেয়। প্রাচীন আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মরুচারী আরবদের জীবনযাত্রা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বংশ-গৌরব, বীরত্বগাঁথা, মর্সিয়া বিভিন্ন ধারায় সে যুগের কাব্যচর্চা হতো। প্রাচীন যুগ থেকে কালের বিবর্তনে আরবী সাহিত্যের উপাদান, বিষয়বস্তু, ভাষাশৈলী সবকিছুতেই এসেছে অনেক নতুনত্ব ও পরিবর্তন।

আরবী কাব্যের ভাবধারায় বড় পরিবর্তনের সূচনা হয় রাসূল সা. এর নবুওয়াতি জীবন থেকে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (সা.) এর প্রশংসায় কাব্য রচনার প্রচলন শুরু হয়। জাহেলী যুগের সাহচর্যে পাওয়া স্বভাবজাত কাব্যপ্রতিভার সাথে ইসলামী বিশ্বাসের

সংযোগে কাব্যচর্চায় নতুন ভাবধারার সূচনা হয়। যা পরবর্তীতে যুগে যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে এবং ইসলামী ভাবধারা আরবী সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়।

নতুনত্বের ধারাবাহিকতায় আধুনিক আরবী সাহিত্যে দেশাত্ত্ববোধের চেতনা, প্রযুক্তির উৎকর্ষতা, প্রকৃতিপ্রেম, কল্পনা-আশ্রিত সাহিত্য, আন্দোলন-সংগ্রাম ইত্যাদি নবতর বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি লক্ষণীয়। একইসাথে ইসলামী ভাবধারায় রচিত সাহিত্যও আধুনিক যুগে অনেক বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আরবী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার উপাদানগুলোর সাথে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিতে আধুনিক আরবী সাহিত্যে যারা অবদান রেখেছেন তাদের অন্যতম ড. নাজিব আল কিলানী। তার ইসলামী ভাবধারায় রচিত গ্রন্থগুলোর ভাষাশৈলী, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনভঙ্গি, ভাবের বহিঃপ্রকাশ সবই অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পর্যায়ে। যা ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এ অভিসন্দর্ভে তার ইসলামী ভাবধারায় রচিত কাব্যগুলোর সাহিত্যিক উৎকর্ষতা ও এতে বিদ্যমান ইসলামী মূল্যবোধ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার শিরোনামের আলোকে ও আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় প্রথম অধ্যায়ে ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এবং সাহিত্যে ইসলামী শিক্ষার উপাদানের বিস্তৃতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনার ইতিহাস সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর আরবী সাহিত্যে ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের ক্রমবিবর্তন সাহিত্যের যুগবিভাগের ক্রমধারা অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ড. নাজিব আল কিলানীর সমসাময়িক যুগ অর্থাৎ আধুনিক যুগের আরবী সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ বিশদভাবে তুলে ধরার হয়েছে। এতে উক্ত যুগে আরবী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে অভিসন্দর্ভের শিরোনামের মূল বিষয় তথা ড. নাজিব আল কিলানীর রচনায় ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে এতে আহমদ শাওকীর পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লিখিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে ড. নাজিব আল কিলানীর ইসলামী রচনাগুলোর সাহিত্যমান পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তার রচনার মৌলিক বৈশিষ্ট্য, ভাষাগত উৎকৃষ্টতা ও তার সমৃদ্ধ চিন্তা-চেতনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে আধুনিক ইসলামী সাহিত্যে ড. নাজিব আল কিলানীর অবস্থান আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তার সমসাময়িক উল্লেখযোগ্য কবিদের সাথে তাঁর একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে। অতঃপর তাঁর সমসাময়িক ও আধুনিক সাহিত্যগবেষকদের দৃষ্টিতে তাঁর মূল্যায়ন তুলে ধরা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের আরবী সাহিত্যপ্রেমী ও একাডেমিক শিক্ষার্থীদের সামনে আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের যে সম্পদগুলো গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে উপস্থাপিত হয়, সেখানে ইসলামী সাহিত্যের পরিমাণ তুলনামূলক কম, অর্থাৎ আরবী সাহিত্যে বিদ্যমান ইসলামী শিক্ষার উপাদানগুলোর যতটা বিস্তৃতি রয়েছে ততটা আলোচিত হয় না। বিশেষত, বাংলাদেশে আরবী সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য বলেই প্রতিয়মান হয়। বলাবাহুল্য, আরবী সাহিত্যের ব্যাপক বিস্তৃত জগতকে সেভাবে আয়ত্তে আনাও দুঃসাধ্য।

তাই একাডেমিক সাহিত্য পাঠের বাইরে শিক্ষার্থী ও সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে আরবী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইসলামী শিক্ষার উপাদানগুলোকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণীত হয়েছে। এর মাধ্যমে আরবী ভাষার সাহিত্যকর্মের প্রতি সাহিত্যপ্রেমী পাঠকদের মূল্যায়ন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা এই সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করুন। (আমীন)

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়

ইসলামী সাহিত্য মানবজীবনের নৈতিক, আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি কেবল বিনোদনের জন্য নয়, বরং মানুষের চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। ইসলামী সাহিত্য কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে ভিত্তি করে গঠিত, যা মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ইসলামী সাহিত্য মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, সততা, ধৈর্য ও পরোপকারের গুণাবলি বিকাশে সহায়তা করে। এটি ইতিহাস, কাব্য, গল্প ও উপন্যাসের মাধ্যমে ইসলামের মূল্যবোধ প্রচার করে। সাহাবা, ওলি-আউলিয়া ও ইসলামী মনীষীদের জীবনী ইসলামী সাহিত্যের অংশ, যা আদর্শ জীবনযাপনের অনুপ্রেরণা জোগায়।

এই সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করে এবং নতুন প্রজন্মকে ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। আধুনিক যুগে এটি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমসাময়িক সমস্যার সমাধান উপস্থাপন করে, যা মুসলমানদের জন্য দিকনির্দেশনামূলক।

অতএব, ইসলামী সাহিত্য শুধু ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য নয়, বরং মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। এটি আত্মশুদ্ধি, জ্ঞানচর্চা ও সভ্যতা গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ।

আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে সাহিত্যের পরিচয়, অতঃপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে ইসলামী সাহিত্যের উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের পরিচয়

সাহিত্যের আভিধানিক অর্থ

‘সাহিত্য’ শব্দটি মূলত সংস্কৃত ভাষার "সাহিত্য" শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ ‘সহিত’ বা ‘একসঙ্গে থাকা’।^১ আবার কেউ সাহিত্য শব্দের অর্থ মিলন, যোগ প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন।^২ সাধারণভাবে, সাহিত্য বলতে মানুষের অনুভূতি, চিন্তা, কল্পনা ও অভিজ্ঞতার সৃজনশীল প্রকাশকে বোঝায়। এটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিককে শব্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে এবং পাঠকের মনে ভাবনা ও অনুভূতির সৃষ্টি করে।

আভিধানিকভাবে সাহিত্য বলতে সুসংগঠিত ও রুচিশীল ভাষায় লিখিত বা কথিত শিল্পময় রচনা বোঝায়, যা মানবজীবনের অভিজ্ঞতা, আবেগ ও কল্পনাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে। বাংলা একাডেমি অভিধান অনুসারে, "সাহিত্য হল সুসংগঠিত, শিল্পিত ও চিন্তাশীল রচনা, যা পাঠকের মনে নান্দনিক আনন্দ ও ভাবের সঞ্চার ঘটায়।"^৩

সাহিত্যের পারিভাষিক অর্থ

পারিভাষিকভাবে সাহিত্য বলতে সে সমস্ত লেখনী বোঝানো হয়, যা কেবল তথ্য প্রদানের জন্য নয় বরং শিল্পসৌন্দর্য, মানবিক আবেগ ও চিন্তার বিকাশ ঘটায়। এটি কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, গদ্য, মহাকাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে মানুষের অনুভূতি ও সমাজের বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

^১ মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স গ্র্যান্ড কোম্পানী, একাদশ সংস্করণ, জুলাই ২০০৯), পৃ. ২২।

^২ শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* (কলিকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৭), ২১শ সংস্করণ, পৃ. ৬৮৬।

^৩ জামিল চৌধুরী (সম্পাদিত), *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল ২০১৬), পৃ. ১৩২৬।

বিভিন্ন সাহিত্যিক সাহিত্য সম্পর্কে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু বিশিষ্ট সাহিত্যিকের মতামত তুলে ধরা হলো—

১. অরিস্টটল : "সাহিত্য হচ্ছে অনুকরণ (Mimesis), যা বাস্তব জীবনের প্রতিফলন মাত্র।"^৮
২. প্লেটো : "সাহিত্য কল্পনার সৃষ্টি, যা বাস্তবতার বিকৃতি ঘটায়।"^৯
৩. সামুয়েল টেলর কোলরিজ : "সাহিত্য হলো সত্য এবং কল্পনার সংমিশ্রণ।"
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "সাহিত্য হলো জীবনের পূর্ণ চিত্র, যেখানে মানবচরিত্র ও প্রকৃতির সংযোগ ঘটে।"^{১০}
৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : "সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ, যা যুগের চিন্তা, রুচি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়।"^{১১}

সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য

সাহিত্য সাধারণত কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়—

১. নান্দনিকতা : সাহিত্য কেবল তথ্যবহুল নয়, বরং তা শিল্পসম্মত ও নান্দনিক।
২. কল্পনা ও আবেগ : সাহিত্য বাস্তবতার পাশাপাশি কল্পনা ও অনুভূতির মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়।
৩. মানবিকতা ও সার্বজনীনতা : সাহিত্য মানবজীবনের সার্বিক দিক তুলে ধরে, যা সময় ও স্থানভেদে গ্রহণযোগ্য হয়।
৪. শিল্পময় ভাষা : সাহিত্যিক রচনা সাধারণ ভাষার তুলনায় অনেক বেশি চিত্রময় ও সংবেদনশীল হয়।
৫. সামাজিক প্রতিচ্ছবি : সাহিত্য সমাজের বাস্তবতা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটায়।

^৮ শরীফ মুহাম্মদ ইউনুছ, *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৪৭-২০০০): একটি পর্যালোচনা*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সেপ্টেম্বর ২০১০।

^৯ প্রাগুক্ত।

^{১০} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্য* (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৫৮), পৃ. ৯।

^{১১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

অর্থাৎ, সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে, সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি মানবচিন্তা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক। সাহিত্য মানুষের আবেগ-অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনাকে সংযুক্ত করে সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। এটি ইতিহাস সংরক্ষণ করে, ভবিষ্যৎ চিন্তার দিকনির্দেশনা দেয় এবং মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়

সাহিত্য হচ্ছে হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ। জীবনের মূল্যবোধগুলো নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সাহিত্য সবসময় সচেতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তাই সাহিত্যিকের মন, সমাজ-পরিবেশ ও প্রকাশভঙ্গী এই তিনটি বিষয়ই বিবেচনার যোগ্য। সাহিত্যিক যা কিছু প্রকাশ করেন তা কেবল তার আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস নয়। বাইরের জিনিসকে তিনি নিজের মনের মত করে, নিজের মনের অনভূতি দিয়ে নিবিড় করে, নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করে হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ আবদুল মান্নান তালিব তাঁর ‘ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান’ গ্রন্থে সাহিত্যের পরিচয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

সামগ্রিকভাবে বিচার করলে একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, সাহিত্য একটি বিশ্বজনীন নিয়ম, একটি সর্বব্যাপী আইন, যা মানবিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অংশ। সাহিত্য শুধুমাত্র মনের কারিগরী নয় আবার শুধুমাত্র বস্তুজগতের অনুরণনও নয়। সাহিত্য সভ্যতার নির্মাতা আবার সভ্যতার প্রাসাদও। একথা সবাই স্বীকার করেন যে, সমাজের প্রভাব সাহিত্যের ওপর পড়ে এবং সাহিত্যের প্রভাব পড়ে সমাজের ওপর। সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের শ্রেণী বিভাগ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক সংগঠন, শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ঐতিহ্য, সমাজের বিশেষ আবেগ-অনুভূতি, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা-আকাংক্ষা এসব কিছুই নিজেদের স্বাভাবিক ও বিশেষ পদ্ধতিতে আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে।^৮

আরবী সাহিত্য গবেষক আহমদ হাসান যাইয়্যাত তার ‘আরবী সাহিত্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে সাহিত্যের সংজ্ঞায় বলেন,

^৮ আবদুল মান্নান তালিব, ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান (ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৫।

কোন ভাষার সাহিত্য মানে সেই ভাষার কবি ও লেখকদের থেকে বর্ণিত অনুপম বক্তব্য, যাতে রয়েছে সূক্ষ্মভাবে কল্পনা ও সাবলিল বিষয়ের চিত্রায়ন, যা আত্মাকে মার্জিত করে, অনুভূতিকে শানিত করে ও ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।^৯

উভয়ের সংজ্ঞাতে একটি যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়, তা হচ্ছে সাহিত্য শুধু মনের ভাব প্রকাশই নয় বরং তার নৈতিক ভিত্তিও জরুরি। প্রথাগত সাহিত্যের সাথে ইসলামী সাহিত্যের মূল পার্থক্য এখানেই। ইসলামী সাহিত্য জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর জীবন বলতে যা ছিল, যা হচ্ছে বা হবে এবং যা হওয়া উচিত সবগুলোকেই বুঝায়। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ইসলাম যে সমস্ত নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পল্লবে শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটিই ইসলামী সাহিত্য। জগত ও জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য এই সব দিকের ওপর ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাত করে।

ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্য

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর মূলভাব থেকে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী সাহিত্য একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাবিসারী। জীবনের যেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে ইসলামী সাহিত্যও তেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে তুলে ধরেছেন এভাবে-

‘আর্ট ফর আর্টস সেক’ ধরনের কোন সাহিত্য যদি থেকেই থাকে তবে ইসলামী সাহিত্যে তার কোন স্থান নেই। আমাদের জীবন যদি উদ্দেশ্যবিহীন না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাহিত্য উদ্দেশ্যবিহীন হবে কেন? আমাদের জীবন যেমন কয়েকটা নিয়মের অধীন তেমনি আমাদের সাহিত্যও। ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপকতা আছে, চিন্তা ও লেখার স্বাধীনতাও আছে। অন্য কোন সাহিত্যে এগুলো যে চেহারা আত্মপ্রকাশ করেছে ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবকাশ নেই। অন্য

^৯ আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবি* (বৈরুত: দারুশ শারকীল আরাবী, ২০০৬), পৃ. ১৭।

সাহিত্য নিজেকে নৈতিক বোধ, বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-শৃংখলার উর্ধ্বে রাখতে চায়। কিন্তু ইসলামী সাহিত্যে তা সম্ভব নয়।^{১০}

উক্ত গ্রন্থে তিনি ইসলামী সাহিত্যকে বিশ্বজনীন সাহিত্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি এ কথারও ব্যাখ্যা করেন যে, ইসলামী সাহিত্য মানেই মুসলিম সাহিত্য নয়, আবার মুসলিম সাহিত্য মানেই ইসলামী সাহিত্য নয়।^{১১} এবং ইসলামী সাহিত্যকে নিছক ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করাটা ভুল। বরং ইসলামী সাহিত্য একটি সার্বজনীন সাহিত্য যার মূলে থাকবে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক উপাদানগুলো। আরবী সাহিত্যের গোটা ইতিহাসেই এ ধারণার প্রমাণ লক্ষণীয়। এর ফলে একদিকে জাহেলী যুগের কবিদের কবিতায়ও ইসলামী শিক্ষার উপাদান দৃশ্যমান হয়, অন্যদিকে পরবর্তী অনেক মুসলিম সাহিত্যিকের রচনায়ও ইসলামী শিক্ষার উপাদান অনুপস্থিত।

ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতা

প্রসঙ্গত, এ বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন যে, ইসলামী সাহিত্যে কীভাবে বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থে আবদুল মান্নান তালিব এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা পেশ করেছেন। তাঁর আলোচনার সারাংশ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

- ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেন,

“যে সব মূল্যবোধের ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য গড়ে ওঠে সেগুলো যেমন ব্যাপক ও বিশ্বজনীন, ইসলামী সাহিত্যের ব্যাপ্তিও তেমনি বিশ্বজনীন। তুরস্কে তুর্কীরা ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য গড়ে তোলে বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের গড়া ইসলামী সাহিত্যের সাথে তার ব্যাপক সাযুজ্য অনুভব করে। জাপানে বা চীনে যে সাহিত্য গড়ে ওঠে

^{১০} আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

^{১১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

তার মানবিক মূল্যবোধটুকুই আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে কিন্তু তুর্কীর ইসলামী সাহিত্যের সবটুকুই আমাদের আপন মনে হয়।^{১২}

- ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার আর একটা দিক হচ্ছে, সমগ্র বিশ্ব-মানবতার জন্য এর সুস্পষ্ট আবেদন রয়েছে। ইসলামী সাহিত্যের মূল্যবোধগুলো যে কোন সাহিত্যের আদর্শ হতে পারে। এগুলো সামগ্রিকভাবে কোন সমাজের স্বার্থবিরোধী নয়। ফলে এ মূল্যবোধগুলো যে কোন সময় যে কোন সমাজের আদর্শ হতে পারে, যদি তারা কল্যাণ ও ন্যায়নীতির স্বার্থে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়।^{১৩}

- গ্রন্থকার ইসলামী সাহিত্যে বিশ্বজনীনতার একটি বড় উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন ‘নারী অধিকার’। এ ব্যাপারে তিনি বলেন,

ইসলামী সমাজ নারীকে যে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে এবং গৃহের যে কেন্দ্রীয় আসনে তাকে স্থাপন করেছে সেটি তার আসল, প্রকৃতিগত ও গুণগত মর্যাদা। কোন জাগতিক বা সংকীর্ণ স্বার্থ তাকে এ আসনে বসাবার ব্যাপারে কাজ করেনি। পৃথিবীতে মানব সমাজের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস ইসলাম প্রদত্ত নারীর এ মর্যাদা ও আসনের প্রতি সামগ্রিকভাবে সমর্থন জানাচ্ছে।^{১৪}

- গ্রন্থকার ইসলামী সাহিত্যের বিশ্বজনীনতার প্রামাণ্য হিসেবে উপস্থাপন করেন রাসূল (সা:) এর বাণীকে যেখানে তিনি কবি লাবীদ বিন রাবিআ’র একটি পংক্তি **الا كل شيء ما خلا** (নিশ্চয়ই আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল) উল্লেখ করে বলেন, সে সত্য কথাই বলেছে।^{১৫} অর্থাৎ, ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সৃষ্ট বা ইসলামী মূল্যবোধগুলোর সাথে সামঞ্জস্যশীল অথবা অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মধ্যে কিছু কিছু ইসলামী মূল্যবোধের

^{১২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

^{১৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

^{১৪} প্রাগুক্ত।

^{১৫} (মূল) আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বুখারী, (অনুবাদ) সম্পাদনা পরিষদ, *আল জামিউস সহীহ*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১০ম সংস্করণ, ২০১৭), খ. , পৃ. , হাদীস নং - ৩৮৪১।

প্রচলনের কারণে তার ভিত্তিতে সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম কোন অমুসলিম সাহিত্যিকের অবদান হলেও ইসলামী সাহিত্য তাকে যথাযথ গুরুত্ব ও স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা করে না।^{১৬}

- এ দৃষ্টিতে টলস্টয়, গ্যেটে, ইলিয়ট, রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ডশ প্রমুখ কবি ও কথাসিিল্পীরা মুসলিম না হলেও তাদের সাহিত্যকর্মের একাংশের সাথে ইসলামী সাহিত্য একাত্বতা ঘোষণা করতেও দ্বিধা করে না।^{১৭}

^{১৬} কবি লাবীদ বিন রাবিআ' (রা:) জাহিলী যুগের কবি ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর এই উক্তিটি ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা। (উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

^{১৭} আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী সাহিত্যের উপাদান

যে উপাদানগুলোর মাধ্যমে মূলত মানুষ শিক্ষার প্রকৃত সুফল অর্থাৎ উন্নত মানবিক জীবন পেতে পারে, সেগুলোকে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে অভিহিত করতে পারি। সাহিত্য মানবিক শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সাহিত্যে শিক্ষার উপাদানগুলোর অন্তর্ভুক্তি ইসলামী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উক্ত উপাদানগুলোকে সাহিত্যের সাথে সমন্বিত করে নিম্নোক্ত দিকগুলো সাহিত্যে ইসলামী শিক্ষার উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে-

১. ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা। এটি একজন সাহিত্যিকের জীবন দর্শনের চিন্তাগত ভিত্তি হিসেবে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য সাহিত্যিক তাদের লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের প্রসারে ভূমিকা রেখেছেন।

২. চারিত্রিক গুণাবলীর উপস্থাপন

প্রকৃত সাহিত্যিক তার ভাষাগত উপস্থাপনার মাধ্যমে তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিক গুণাবলী ও বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, একই সাথে সমকালীন নৈতিকতা বিবর্জিত পরিবেশের যাবতীয় নেতিবাচক দিকও তার লেখায় ফুটে উঠে। এ উপাদান অসংখ্য সাহিত্যিককে ইতিহাসে আলাদা স্থান করে দিয়েছে।

৩. সমাজ ও পরিবেশ

সমাজ ও পরিবেশের গভীরতর পর্যবেক্ষণ ও তা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে সাহিত্যে অন্তর্ভুক্তকরণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে এ ধরনের সাহিত্য রচনা পাঠককে তার চারপাশের অবস্থা ও নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

৪. অপসংস্কৃতি ও কু-সংস্কার অপসারণ

ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এটি। প্রথাগত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যভাণ্ডারে অপসংস্কৃতির ও কু-সংস্কারের সয়লাব লক্ষ্য করা যায়। এর বিপরীতে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা কী তা লেখনীতে অন্তর্ভুক্ত করে যুগে যুগে জাতিকে ঋণী করে গেছেন অসংখ্য সাহিত্যিক।

৫. শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষা বিপ্লব

সাহিত্যে বিরাজমান ইসলামী শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য বলা যেতে পারে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রচেষ্টাকে। ইসলামের সোনালী যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যা অনুধাবন ও তার সংস্কারের প্রয়োজনে মূল্যবান লেখনী জাতিকে উপহার দিয়েছেন।

ইসলামী সাহিত্যের উপাদান অত্যন্ত বিস্তৃত বিষয়। সংক্ষিপ্ত কলেবরের আলোচনায় একে ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে সামগ্রিকভাবে উপরোল্লিখিত উপাদানগুলোকে সারাংশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এ অভিসন্দর্ভের পরবর্তী অধ্যায়ে আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে উক্ত উপাদানগুলো কীভাবে সূচনা লাভ করেছে ও তার ক্রমবিবর্তন ঘটেছে সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিকাশধারা

পৃথিবীর ইতিহাস পড়লে আমরা দেখতে পাই, প্রতিটি জাতি বা গোত্রের সাথে জড়িয়ে আছে সাহিত্য, হোক সেটি কোনো গল্প বা কাহিনী, কবিতা বা গান। আরবদের সম্পর্কে যখন কোনো আলোচনা হয় তখন সর্বপ্রথম তাদের যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে তা হলো ভাষার জোর ও বাগ্মিতা। রাসূল (সা.) এর আগমনের পূর্বে আরবরা ছিল একটি কাব্য-রসিক জাতি। তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাদের নিকট কবির স্থান ছিল সবার উপরে। তারা কবি ও নবীকে একই কাতারের মানুষ বলে মনে করতো। তাইতো তারা রাসূলুল্লাহকে (সা) কবি বলে আখ্যায়িত করেছিল।^{১৮}

আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির এমনি এক পর্যায়ে ইসলামের অভ্যুদয় ঘটে। তখন আরবী সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল। জাহিলী যুগের যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা ও খুতবা। এ যুগে দাওয়াতী কার্যক্রম, বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতে মুসলমানদের খুতবা বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল।^{১৯} পাশাপাশি কবিতাও যুগের বিবর্তনে নতুনত্ব লাভ করতে থাকে। এ অধ্যায়ে আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারার সূচনা ও ক্রমবিবর্তন আলোচিত হয়েছে।

^{১৮} ইবনে রাশীক আল কাইরাওয়ানী, *আল 'উমদাহ ফি মাহাসিনিস শি'রী ও আদাবিহি*, (বৈরুত: দারুল জিল, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮১
ঈসায়ী), খ. ১, পৃ. ৭৮।

^{১৯} আল জাহিয়, *আল বায়ান ও ওয়াত তাবয়ীন*, (কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ৭ম সংস্করণ, ২০০৮), খ. ২, পৃ. ৯৮।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের সূচনা

আরবী সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় জাহেলী যুগের কথা। তৎকালীন আরবদের মাঝে মানবতাবোধের চরম অভাব থাকলেও তাদের সাহিত্যপ্রতিভাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাদের সাহিত্যচর্চার প্রধান ক্ষেত্র ছিল কবিতা। কবিতা রচনায় সাবলীলতার অধিকারী দক্ষ কবিদের হাতে রচিত প্রাচীন কবিতায় ব্যাপক শব্দ প্রকরণ এবং বাক্য বিন্যাস, বিস্ময়কর ভাব সৃষ্টি ও অর্থবৈচিত্রের অসাধারণ ক্ষমতা যে ভাবে পরিলক্ষিত হয় অন্য কোন ভাষায় সেরূপ পাওয়া যায় না। জাহেলী যুগে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একাধিক কবি ছিলেন। তাঁরা তাদের প্রচলিত জীবনধারা সম্পর্কে অধিক ওয়াকিবহাল ছিলেন। কবিতার মাধ্যমে তারা স্বাধীন ভাবে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতেন। নিম্নে আরবী কবিতার পরিচয় বর্ণনাপূর্বক কবিতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হলো।

আরবী কবিতার পরিচয়

কবিতার আরবী প্রতিশব্দ شعر^{২০} এর দুটি অর্থ অভিধানশাস্ত্রে পাওয়া যায়-

১. অনুধাবন।
২. জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা।^{২১}

কবিতার পারিভাষিক সংজ্ঞা আরবী সাহিত্য গবেষকগণ বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। যথা-

১. ড. তুহা হুসাইনের মতে, কবিতা এমন বাক্যের নাম যা হবে ছন্দোবদ্ধ এবং কবির কল্পনাপ্রসূত, এবং এতে তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। এ বিবেচনায় ব্যাকরণে উল্লিখিত ছন্দগুলো কবিতা নয়, কারণ সেখানে কবির কল্পনা অনুপস্থিত।^{২২}

^{২০} মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী, আরবী বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), খ. ২, পৃ. ১৪৩২। ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৪৩৩।

^{২১} ইবনে মানযুর, লিসানুল আরব, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪০৯।

^{২২} ড. তুহা হুসাইন, ফিশ শিরিল জাহিলী (কায়রো: ফারুক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, ১৯৩১), পৃ. ৩২৭।

২. আহমদ হাসান যাইয়্যাত বলেন, কবিতা সেই ছন্দোবদ্ধ মিলযুক্ত বাক্যকে বলে, যা বিরল চিন্তা, নতুন কল্পনা এবং অর্থপূর্ণ ছবি ও দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে। আর এটা কখনো গদ্যের মাধ্যমে হয় আবার কখনো পদ্যের মাধ্যমে হয়।^{২৩}

কবিতার সার্বজনীন সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। সর্বোপরি এ কথা বলা যেতে পারে যে, কবিতা হচ্ছে ব্যক্তির মনের ভাবের ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ, যাতে শৈল্পিক সৌন্দর্য ও ভাষার উৎকৃষ্টতা বিদ্যমান। আরবী কবিতার ভাষাগত বিশ্লেষণ করলে এর যথার্থতা প্রতিয়মান হয়।

আরবী কবিতার সূচনাকাল

আরবী কবিতার উৎপত্তির সময়কাল নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। এ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদও রয়েছে অনেক। অনেক ঐতিহাসিক খ্রিস্টীয় ৫ম শতকে আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল বলে চিহ্নিত করেছেন। আরবী সাহিত্যের জাহিলী যুগের প্রাপ্ত কবিতাগুলো যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেগুলোতে যে ভাষাগত মান লক্ষ্য করা যায়, তাতে কবিতাগুলোকে অত্যন্ত পরিমার্জিতরূপেই পাওয়া যায়, কাজেই সেগুলোকে সাহিত্যের সূচনালগ্নের কবিতা হিসেবে গণ্য করা যায় না। সেগুলোর অধিকাংশই ৬ষ্ঠ শতকে রচিত।^{২৪}

এছাড়া অনেক ঐতিহাসিক কবি ইমরাউল কায়সকে প্রথম কবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন, কিন্তু এ মতটিকেও সঠিক হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। কেননা ইমরাউল কায়সসহ সমসাময়িক একাধিক কবির কবিতা থেকে বুঝা যায়, তাদের পূর্বেও আরো অনেক কবি বিগত হয়েছেন। যেমন, ইমরাউল কায়সের একটি কবিতার পঙ্ক্তি নিম্নরূপ-

عوجا على الطلل المحيل لعلنا نبكي الديار كما بكى ابن خزام

^{২৩} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাপ্ত, পৃ. ২৮।

^{২৪} মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৯), পৃ. ৯।

অর্থ: প্রেসার প্রাচীন বাস্তবতার নিকট থাম, বিলুপ্তপ্রায় গৃহের কাছে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে কেঁদে
নিই, যেভাবে ইবনে খিয়াম কেঁদেছেন।^{২৫}

মুয়াজ্জাকার অন্যতম কবি আনতারাহ বিন শাদাদের একটি বিখ্যাত পঙক্তি থেকেও তার পূর্বে
অনেক কবি বিদ্যমান থাকার প্রমাণ বহন করে-

هل غادر الشعراء من متردم

অর্থ: কবিরা কি পূরণ করার জন্য কোন শূন্যস্থান রেখে গেছেন? ^{২৬}

জাহিলী যুগের প্রখ্যাত কবিদের এ ধরনের আরো অনেক কবিতার মাধ্যমে এ কথার প্রমাণ
পাওয়া যায় যে, তাদের পূর্বেও বহু কবি গত হয়েছেন। তবে জাহিলী যুগে কবিতার যে উন্নত ও
পরিমার্জিত রূপ পাওয়া যায়, তার পূর্বের কোন যুগের তেমন ইতিহাস সংরক্ষিত নেই। তাই,
ঐতিহাসিকদের মতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক আরবী সাহিত্যের সূচনাকাল।

পূর্বে ইসলামী সাহিত্যের সার্বজনীনতার আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে যে, কোন অমুসলিম
সাহিত্যিকের রচনায়ও ইসলামী শিক্ষার উপাদান বিদ্যমান থাকতে পারে। এবং সে বিষয়টি
ইসলাম যথাযথ মূল্যায়নও করেছে। এ বিবেচনায় আরবী কবিতার প্রাচীন যুগ তথা জাহিলী
যুগের কবিতায় ইসলামী শিক্ষার উপাদান লক্ষণীয়। পরবর্তী পরিচ্ছেদে জাহিলী যুগ থেকে
অদ্যাবধি আরবী কবিতায় বিদ্যমান ইসলামী মূল্যবোধ সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

ইসলাম মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি মানুষ এ বৈশিষ্ট্য নিয়েই
জন্মগ্রহণ করে। পরবর্তীতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে মানুষের বিশ্বাসগত পরিবর্তন সূচিত
হয়। তবে প্রতিটি সৃষ্টিজীবই ইসলামের মৌলিকত্বকে ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে
ইরশাদ হচ্ছে,

^{২৫} মুস্তফা আবদুশ শাফী, *দীওয়ানু ইমরাউল কায়স* (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তা.বি.), পৃ. ৭৯-৮০, উদ্ধৃত: আবু
নোমান মো: আব্দুর রহীম, *আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৪৯।

^{২৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০।

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ^{২৭}

অর্থ: নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে

আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

এ বিষয়টি হাদীসেও উল্লিখিত আছে। রাসূল (সা:) ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ^{২৮}

অর্থ: প্রত্যেক নবজাতকই ফিতরাতেই ফিতরাতেই উপর জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে

ইয়াহুদী, নাসারা বা মাজুসী (অগ্নিপূজারী) রূপে গড়ে তোলে।

সুতরাং ইসলামী মূল্যবোধ ধারণ করা একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য, যা বিবেকবান ব্যক্তিদের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, এমনকি সে ভিন্ন বিশ্বাসের হলেও। এর উদাহরণ সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সব যুগেই বিরাজমান।

^{২৭} আল কুরআন, সূরা আলে ইমরান - ৮৩।

^{২৮} আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বুখারী, আল জামিউস সহীহ, প্রাপ্ত, খ. ৩, পৃ. ২৮, হাদীস নং - ১৩৫৯।

জাহিলী যুগ

জাহিলী যুগের অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু প্রেয়সীর গুণকীর্তন, প্রিয়ার বাস্তবিতায় রোদন, বাহনের বর্ণনা, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিবরণ, বংশ-গৌরব, বীরত্বগাঁথা ইত্যাদি হলেও তাদের রচিত কবিতাবলির মধ্যে নৈতিক গুণাগুণ, আল্লাহর উপর আস্থা ও আখিরাতে বিশ্বাস, কর্মের প্রতিদান ইত্যাদি ফুটে উঠত। জাহিলী যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন কবি ও তাদের কবিতায় বিদ্যমান ইসলামী ভাবধারার উদাহরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. তা'আব্বাতা শাররান

কবি তা'আব্বাতা শাররান (মৃত্যু- ৫৩০ খ্রি.) জাহিলী যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন। তার প্রকৃত নাম ছাবিত ইবনে জাবির ইবনে সুফিয়ান আল ফাহমী।^{২৯} 'তা'আব্বাতা শাররান' ছিল তার উপাধি। তার একটি কবিতায় আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে মানুষের কর্মের প্রতিদান দেওয়ার বিষয়ে তার বিশ্বাস ফুটে উঠেছে এভাবে-

جزى الله فتيانا على العوص أمطرت سماؤهم تحت العجاجة بالدم^{৩০}

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা সেই সব যুবকের প্রতিদান দিন, যারা 'আওস' ভূমিতে ঘোরতর যুদ্ধ করেছে। যুদ্ধে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণার নীচে তাদের আকাশ রক্ত বর্ষণ করেছে।

ইসলামে হারাম মাসকে সম্মান করা এবং এ সময়ে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কবি তা'আব্বাতা শাররান তার অপর একটি কবিতায় তার প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে হারাম মাসে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার ঘোষণা তুলে ধরেন এভাবে-

فعدوا شهور الحرم ثم تعرفوا قتيل أناس أو فتاة تعانق^{৩১}

অর্থ: তোমরা হারাম মাস গণনা করে অতিবাহিত কর। অতঃপর নিহতদেরকে অথবা তাদেরকে চিনে রাখো যারা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে।

^{২৯} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৬), পৃ. ৪৯।

^{৩০} মুতা সাফাদী ও ঈলিয়া জাবী সম্পা., আল মাওসু'আতুশ শিরিল জাহিলী (বৈরুত: শারিকা খায়্যাতি, ১৯৮৪), খ. ১, পৃ. ৯৭।

^{৩১} আল মাওসু'আতুশ-শিরিল-জাহিলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১।

২. নাবিগা আয-যুবইয়ানী

মু'আল্লাক্বার^{৩২} অন্যতম কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী (মৃত্যু- ৬০৪ খ্রি.) ছিলেন জাহিলী যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের একজন। তার প্রকৃত নাম যিয়াদ ইবনে মুয়াবিয়াহ। 'নাবিগা' তার উপাধি। তিনি বিজ্ঞ কবি হিসেবে উকাজ মেলায় বিচারকের আসনে সমাসীন হতেন। পাশাপাশি তিনি তার গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ধি-চুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতেন।^{৩৩} তার বিভিন্ন কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের ছাপ বিদ্যমান। যেমন, একটি কবিতায় তিনি আল্লাহর নামে শপথের গুরুত্ব এবং আল্লাহ তায়ালায় সমগ্র সৃষ্টিজগতব্যাপী একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন এভাবে-

حلفت، فلم أترك لنفسك ريبة و ليس وراء الله للمرء مذهب^{৩৪}

অর্থ: আমি কসম করছি, তাই তোমার জন্য কোন সন্দেহের অবকাশ রাখিনি। আর মানুষের জন্য আল্লাহকে ছেড়ে পালিয়ে যাবার কোন জায়গা নেই।

উক্ত চরণটিকে কেন্দ্র করে চমৎকার একটি ঘটনার বর্ণনাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, হযরত উমর (রা:) একদিন লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আরবের শ্রেষ্ঠ কবি কে?' উত্তরে তারা বললো, হে আমীরুল মু'মিনিন! এ ব্যাপারে আপনিই বেশি অভিজ্ঞ। এরপর তিনি এই চরণটি আবৃত্তি করে বললেন, এটি কার কবিতা? তারা বললো, নাবিগার। তিনি বললেন, সে-ই আরবের শ্রেষ্ঠ কবি।^{৩৫}

ইসলামে আমানত রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবি নাবিগার কবিতায় এ বিষয়েরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন, তিনি বলেন-

^{৩২} 'মুআল্লাক্বা' (আরবি: المعلقات) হচ্ছে আরবি জাহিলি যুগের এক উল্লেখযোগ্য কাব্য সংকলন। তৎকালীন আরবে উকাজ এর মেলা খুব প্রসিদ্ধ ছিল। এই মেলায় কবিরা তাদের কবিতা শোনাতে। যে কবিতাটি সব থেকে ভালো হত সেই কবিতাটি সোনার হরফে লিখে পবিত্র মক্কার কাবার দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হত। যেহেতু এগুলো টাঙিয়ে রাখা হত তাই এর নাম রাখা হয় মুআল্লাক্বা বা ঝুলন্ত। এই কবিতাগুলো কবি হাম্মাদ আর রাবিয়া আব্বাসি যুগে সংকলন করেন। (আ. ত. ম. মুহলেহউদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।)

^{৩৩} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

^{৩৪} আল মাওসু'আতুশ-শি'রিল-জাহিলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭১।

^{৩৫} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

فَأَلْقَيْتِ الْأَمَانَةَ لَمْ تَخْنَهَا كَذَلِكَ كَانَ نُوحٌ لَا يَخُونُ^{৩৬}

অর্থ: তুমি আমানত সযত্নে রেখে দিয়েছ, যার কোনরূপ খিয়ানত তুমি করনি, এমনভাবে নূহ

(আ:)ও আমানতের খিয়ানত করতেন না।

৩. যুহাইর ইবনে আবী সুলমা

জাহিলী যুগের তিনজন শ্রেষ্ঠ কবির অন্যতম হিসেবে বিবেচিত কবি যুহাইর ইবনে আবী সুলমা (মৃত্যু- ৬০৯ খ্রি.)^{৩৭} তিনি বংশগতভাবে কাব্যচর্চার পরিবেশে বেড়ে উঠেন। ধার্মিক ও নীতিবান ব্যক্তি হিসেবে তার খ্যাতি ছিল। তার অসংখ্য কবিতায় ইসলামের মূল ভাবধারার প্রভাব বিদ্যমান। যেমন- একটি কবিতায় তিনি আল্লাহ তায়ালার সর্বজ্ঞাত হওয়ার গুণটি তুলে ধরেছেন এভাবে-

فَلَا تَكْتُمَنَّ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ لِيَخْفَى، وَ مَهْمَا يَكْتُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ^{৩৮}

অর্থ: তোমাদের অন্তরে যা আছে তা গোপন করার জন্য লুকিয়ে ফেলো না। কারণ আল্লাহর

নিকট কোন কিছু গোপন করা হলেও তিনি তা জেনে ফেলেন।

অপর একটি কবিতায় তিনি মানুষের কর্মফল নির্ধারিত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। পবিত্র কুরআনে যেমন বলা হয়েছে, “বড় শাস্তি আসার পূর্বে আমি অবশ্যই তাদেরকে ছোট শাস্তি আশ্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে।”^{৩৯} অর্থাৎ, মানুষের কর্মের চূড়ান্ত ফল আখিরাতে নির্ধারিত হলেও দুনিয়াতেই কিছু শাস্তি সতর্কতা স্বরূপ আল্লাহ তায়ালা দিবেন। সে বিষয়টি তার একটি কবিতায় তুলে ধরেছেন। পঙক্তিটি হলো-

يُؤْخِرُ فَيُؤْخِرُ فِي كِتَابٍ، فَيَذَرُ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، أَوْ يَجْعَلُ فَيَنْقِمُ^{৪০}

^{৩৬} ড. ইবরাহীম আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ, আশ-শিরকুল জাহিলী: কাদায়াতুল ফামিলিয়াহ ওয়াল মাওদুইয়াহ (বৈরুত: দারুন নাহদা আল আরাবিয়াহ, ১৯৮০), পৃ. ১১৩।

^{৩৭} আল ইসফাহানী, কিতাবুল আগানী (বৈরুত: মুআসসাসাতুল রিসালাহ, তা.বি.), খ. ৬, পৃ. ২১০।

^{৩৮} আল মাওসু'আতুশ-শিরিল-জাহিলী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৮।

^{৩৯} আল কুরআন, সূরা সাজদাহ - ২১।

^{৪০} আল মাওসু'আতুশ-শিরিল-জাহিলী, প্রাগুক্ত,

অর্থ: অপরাধীকে অবকাশ দেওয়া হবে। অতঃপর হিসেবের জন্য তা জমা রাখা হবে, অথবা
শীঘ্রই দুনিয়াতে সে শাস্তি দেওয়া হবে।

৪. আনতরাহ বিন শাদ্দাদ

আনতরাহ বিন শাদ্দাদ (মৃত্যু- ৫৯৯ খ্রি.) মুয়াল্লাকা রচয়িতা কবিদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা। তার অধিকাংশ কবিতায় যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা বেশি স্থান পেয়েছে। তার বেশ কিছু কবিতায় বিভিন্ন ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন একটি কবিতায় তিনি একাধিক ইসলামী পরিভাষা যেমন ‘সিজদায় লুটিয়ে পড়া’, ‘মাক্বামে ইবরাহীম’, ‘জাহান্নামের আগুন’, ‘হাশর’ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। কবিতাটির কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ-

إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له أعادينا سجودا
عجوز من بني حام بن نوح كأن جبينها حجر المقام
كلما ذقت باردا من لماها خلته في فمي كنار الجحيم
و رجعت عنهم لم يكن قصدي سوى ذكر يدوم إلى أوان
المحشر^{৪১}

অর্থ: আমাদের শিশু যখন দুধ ছেড়ে দেওয়ার সময়ে পৌঁছে যায়, তখন শক্রগণ (ভয়ে) তার উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। তারা হাম ইবনে নুহ (আ:) এর বংশের বৃদ্ধ লোক, তাদের কপাল যেন মাক্বামে (ইবরাহীম) এর পাথর। যখনই আমি তাদের ঠোঁট থেকে শীতল পরশ আস্বাদন করতে যাই তখন আমার মুখে জাহান্নামের আগুনের ন্যায় তাপ অনুভব করি। আর আমি তাদের কাছ থেকে ফিরে আসি এমন অবস্থায় যে, আমার ইচ্ছা কেবল (এ অনাকাঙ্ক্ষিত স্মৃতিকে) স্মরণ করা ছাড়া আর কিছু হয় না, যে স্মরণ হাশরের ময়দান পর্যন্ত স্থায়ী।

উপর্যুক্ত কবিদের পাশাপাশি আরো অনেক কবিদের লেখনীতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাব লক্ষ্য

^{৪১} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

করা যায়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কবি সামওয়াল ইবনে আদিয়া (মৃত্যু ৫৫৮ খ্রি.), মুছাক্কীব আল আবদী (মৃত্যু ৫৮৭ খ্রি.), উমাইয়া ইবনে আবিস সালত (মৃত্যু ৬২৬ খ্রি.), আবীদ ইবনুল আবরাস (মৃত্যু ৬০০ খ্রি.), মহিলা কবি জালীলা বিনতে মুররা (মৃত্যু ৫৩৮ খ্রি.) প্রমুখ।^{৪২}

^{৪২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৭০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী যুগ

আরবী সাহিত্যে ইসলামী যুগ বলতে বোঝানো হয় মূলত রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নবুওয়াতের সময় থেকে খিলাফতে রাশেদার সমাপ্তিকাল পর্যন্ত। অর্থাৎ, ৬২২ থেকে ৬৬১ খ্রি।^{৪৩} হিজরতের পর মুসলমানদের প্রতি ক্রোধ ও হিংসার পুরোপুরি প্রতিফলন না ঘটতে পেরে কাফিররা কাব্য রচনার মাধ্যমে তাঁদের সম্মানকে খাটো করার এক ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। মুসলমানদের নিন্দায় কাব্য রচনায় এগিয়ে আসে মক্কার উল্লেখযোগ্য কবি আবু সুফিয়ান ইবনুল হারিছ, আব্দুল্লাহ ইবনু যিবারা, দিরার ইবনুল খাত্তাব, আবু আযযা আল জুমাহী, হারিছ ইবনে হিশাম, হুবারা ইবনে ওয়াহাব এবং মুয়াবিয়া ইবনে যুহাইর প্রমুখ।^{৪৪}

তাদের কবিতার জবাবে মুসলমানদের পক্ষ থেকেও কুরাইশদের নিন্দায় এগিয়ে আসেন হাসসান বিন সাবিত, কা'ব বিন যুহাইর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা:)।^{৪৫} তবে নিন্দাবাদ ও তার জবাবে রচিত এসব কবিতা রচনার ধারা মক্কা বিজয়ের পর থেমে যায়। তখন আরবী কবিতায় আল্লাহ তায়ালার শান, ইসলামের মাহাত্ম্য, রাসূল (সা:) এর মর্যাদা, পূর্বের জাহিলী যুগের প্রতি অনুতাপ ও আক্ষেপ ইত্যাদি প্রকাশ পেতে থাকে। এ ধারায় কাব্য রচনায় কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি ও তাদের কবিতা নিম্নে বর্ণিত হলো-

হাসসান বিন সাবিত (রা.)

হাসসান বিন সাবিত (রা.) জাহিলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের জবাব দিতেন জাহিলী যুগের কবিতার ধারায়। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তিনি পূর্বের কবিতা রচনার ধারা ত্যাগ করে রাসূল (সা:) এর প্রশংসা ও ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন

^{৪৩} ড. আ. ত. ম. মুসলেহউদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২), পৃ.

৬

^{৪৪} ড. আব্দুল জলীল, *আরবী সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, ৭২।

^{৪৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রশংসায় তাঁর রচিত কাব্যের জন্য। তাঁর কাব্যের সবচেয়ে বিখ্যাত পঙক্তিটি নিম্নরূপ-

و أحسن منك لم تر قط عيني و أجمل منك لم تلد النساء
خلقت مبراً من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء^{৪৬}

অর্থ: আমার চোখ কখনো আপনার চেয়ে উত্তম কিছু দেখেনি,

কোন নারী আপনার চেয়ে উত্তম সন্তান জন্ম দেয়নি,

আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সকল ক্রটি থেকে মুক্ত করে,

যেন আপনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই আপনাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) কুরাইশদের বিভিন্ন কটুক্তিমূলক কাব্যের জবাবে তাদের নিকৃষ্ট বিশ্বাস ও জাহিলী যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবন নিয়ে লজ্জাজনক কথা দিয়ে কাব্য রচনা করতেন। বলাবাহুল্য, এ ধরনের কবিতাই তাদেরকে বেশি কষ্ট দিত। পরবর্তীতে তিনিও এ ধারার পরিবর্তে ইসলামের মহান শিক্ষাকে কাব্যের ভাষায় প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা হচ্ছে- تالله لولا الله ما اهتدينا، باسم الإله وبه بدينا، لاهم إن العيش - عيش الآخرة ইত্যাদি। তাঁর কবিতাগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত চরণটি উল্লেখযোগ্য, যেখানে তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েত লাভের বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছেন-

تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا^{৪৭}

অর্থ: আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তায়ালার না থাকলে আমরা হেদায়েত পেতাম না, আমরা সালাত

আদায় করতাম না ও সদকাহ দিতাম না।

অপর আরেকটি কবিতায় তিনি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার সত্যতা ঘোষণা করে বলেন,

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى للكافرين^{৪৮}

অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর জাহান্নাম হলো কাফিরদের ঠিকানা।

^{৪৬} আব্দুল্লাহ আলী মুহাম্মা সম্পা. দীওয়ানু হাসসান বিন সাবিত (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪), পৃ. ২১।

^{৪৭} ড. ওয়ালীদ ইবরাহীম কাসসাব সম্পা. দীওয়ানু আব্দিল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রিয়াদ: দারুল উলুম, ১৯৮২), পৃ. ৮৪।

^{৪৮} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।

আব্দুল্লাহ ইবনে যিবা'রা (রা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে যিবা'রা (রা.) জাহিলী যুগে মক্কার উল্লেখযোগ্য কবিদের একজন ছিলেন। উহুদ যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে হাসসান বিন সাবিত (রা.) এর একটি কবিতা পড়ে অনুতপ্ত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর কবিতায় পূর্বের জীবনের প্রতি আক্ষেপ ও অনুতাপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

يا رسول المليك إن لساني رائق ما فتقت إذ أنا بور
إذ أجارى الشيطان في سنن الغي و من مال ميله مثبور

অর্থ: হে প্রভুর রাসূল! আমার জিহ্বা ভুল করেছে যখন আমি গোমরাহ ছিলাম। যখন ভ্রান্ত পথে
শয়তানকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আর যে সেদিকে ঝুঁকে তার ঝোঁক বিনষ্ট হয়ে যায়^{৪৯}

ইসলামী যুগের কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

১. শাব্দিক বৈশিষ্ট্য

এ যুগের কবিতাগুলো তুলনামূলক সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। জাহিলী যুগের কবিতাগুলো অধ্যয়ন করতে প্রয়োজন ইসলামী কবিতা সে তুলনায় অনেকটাই সহজবোধ্য। উদাহরণ স্বরূপ, কবি ইমরাউল কায়সের একটি কবিতায় ঘোড়ার বিবরণ নিম্নরূপ:

مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل^{৫০}

উক্ত চরণটির শব্দ ও অত্যন্ত দূর্বোধ্য যার অর্থ পূর্ণরূপে বোঝার জন্য অভিধানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে হাসসান বিন সাবিত (রা:) রচিত কাব্যের প্রতি লক্ষ্য করলে তুলনামূলক সহজ ও প্রাঞ্জল শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, রাসূল (সা:) এর প্রশংসায় তিনি বলেন,

شهدت بأذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عل^{৫১}

এ চরণে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ সহজেই বোধগম্য। একইভাবে এ যুগের সমস্ত কবিতায়ই জাহিলী যুগের তুলনায় শাব্দিক সহজবোধ্যতা লক্ষণীয়।

^{৪৯} প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪।

^{৫০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

^{৫১} প্রাগুক্ত।

২. বর্ণনাভঙ্গি ও বাক্যগত বৈশিষ্ট্য

এ যুগের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বর্ণনাভঙ্গির সাবলিলতা। কারণ এযুগের কবিতা সরাসরি পবিত্র কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর পবিত্র কুরআনের উপদেশ বর্ণনার ধরন এমন যেন মানুষ সহজেই বুঝতে পারে। পূর্বোক্ত উদাহরণে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পাশাপাশি এমন অনেক কবিতা রয়েছে যেগুলোতে হুবুহু কুরআনের আয়াতের বাক্যশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, হাসসান বিন সাবিত (রা:) এর অপর একটি কবিতা নিম্নরূপ:

الحمد لله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما
المولج الليل في النهار و في الليل نهارا يفرج الظلما
الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يصير دما^{৫২}

প্রশংসা আল্লাহর, যার কোন শরীক নেই। যে ব্যক্তি এই কথা বলে না, সে নিজের উপরই জুলুম করে। যিনি রাতকে দিনে এবং রাতকে দিনে প্রবেশ করান, তিনি অন্ধকার দূর করেন। তিনি স্রষ্টা, উৎপত্তিকর্তা, রূপদাতা, তিনি গর্ভে জল প্রবাহিত করেন যতক্ষণ না তা রক্তে পরিণত হয়।

এ কবিতায় অধিকাংশ শব্দই পবিত্র কুরআন থেকে সংকলিত এবং বাক্যশৈলীও পুরোপুরি কুরআনের অনুসৃত।

৩. বিষয়বস্তুগত বৈশিষ্ট্য

রাসূল (সা:) এর আগমন এবং কোরআন নাজিলের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই মূল্যবোধ তৎকালীন যুগের আরবী কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে। ফলে আরবী কবিতায় ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। এ সময়ে জাহেলী যুগের অনেক বৈশিষ্ট্য বর্জন করা হয়। যেমন-

১. অশ্লীলতা
২. মিথ্যা বংশ গৌরব
৩. মদ ও জুয়া সম্পর্কিত বর্ণনা

^{৫২} ইবনে কুতায়বা, আশ শিরু ওয়াশ শুআরাউ, (বৈরুত: দারুছ হাফাফাহ, ১৯৬৪), খ. ১, পৃ. ২৫৩।

৪. অশোভনীয় ভাষায় নিন্দাবাদ

৫. মিথ্যা প্রশংসা ইত্যাদি

আর এ যুগে নতুন কিছু বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়। যেমন-

১. ধর্মীয় ও নৈতিক গুণাবলীর আলোচনা

২. আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলের প্রশংসা

৩. জ্ঞান ও নীতি বিষয়ক কবিতা

৪. ইসলাম গ্রহণের অনুভূতি

৫. পূর্বের জীবনের আক্ষেপ ইত্যাদি

এভাবে সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে ইসলামী শিক্ষার উপাদানের প্রসার ঘটতে থাকে। জাহিলী যুগ থেকে বংশ পরম্পরায় কিংবা পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির প্রভাবে প্রাপ্ত কাব্যপ্রতিভা যখনই ইসলামের সংস্পর্শ লাভ করেছে, তখন তা ইসলামের মাহাত্ম্য ও আদর্শ প্রচারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর প্রভাব পরবর্তী যুগগুলোতেও লক্ষ করা যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া যুগ

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর শাহাদাত (৪০ হি./৬৬১ খৃ.) এর পর থেকেই উমাইয়া যুগের সূচনা হয়। এর সমাপ্তি ঘটে আব্বাসীদের হাতে দ্বিতীয় মারওয়ানের পতনের মাধ্যমে (১৩২ হি./৭৫০ খৃ.)।^{৫০} বিভিন্ন দিক থেকে এ যুগটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তন্মধ্যে একটি হল আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের বিশাল অংশ বিজিত হয়। বিজিত অঞ্চলসমূহে আরব মুসলিমগণ ব্যাপক হারে হিজরত করেন এবং সেখানকার সাধারণ জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা করার ফলে তাদের মধ্যে আরবী ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

অপরদিকে উমাইয়া যুগ থেকে আরবীকে সেখানকার সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করা হয়। সেখানকার গভর্নর নিয়োগ করা হয় খাঁটি আরব জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে এবং অন্যান্য রাজকর্মচারি হবার জন্য আরবী ভাষা জানার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়।^{৫১} এসব কারণে বিজিত অঞ্চল সমূহেও আরবী ভাষার চর্চা শুরু হয় পুরোদমে। তাছাড়া উমাইয়া শাসকগণ আরবী ভাষার কবি-সাহিত্যিকদেরকে নানাভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত করেন। ফলে এ সময় সাহিত্য চর্চা বিশেষত কাব্য চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। আলী (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে কৃষ্ণায় স্থানান্তর করা হয়। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে কূফা ও বসরার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। সেখানে গড়ে ওঠে জ্ঞান বিতরণের কেন্দ্র।

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি-প্রভৃতির প্রভাব যেমন এ যুগের কাব্যে দৃশ্যমান তেমনি দীন ও ইসলামের প্রভাবও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে এ যুগের কাব্যে। রাসূল (স.) ও

^{৫০} আ ত ম মুসলেহুদ্দীন, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

^{৫১} ড. আহমদ নাসীফ আল জানাবী, *মালামিহ মিন তারীখিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, (ইরাক: দারুর রাশীদ, ১৯৮১), পৃ. ১০৫।

সাহাবায়ে কিরামের যুগে ইসলামের চর্চা ও অনুশীলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। তাঁদের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলামী অনুশাসন, ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ইসলামী ভাবধারায় নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হত। যদিও রাসূল (স.) ও সাহাবায়ে কিরামের যুগের তুলনায় তার পরিমাণ অনেক কম। এ যুগে ইসলামী ভাবধারায় রচিত কাব্যের কিছু দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আরবী ব্যাকরণবিদ আবুল আসওয়াদ দুয়াইলীর (রহ:) কাব্যে ইসলামী মূল্যবোধ

আরবী ব্যাকরণের অন্যতম পথিকৃৎ নাহশাশ্বের প্রবর্তক আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী (রহ:) একজন তাবেয়ী ছিলেন। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রের পাশাপাশি ইলমে ফিকহেও অগাধ পাণ্ডিত্য রাখতেন। তাঁর রচিত অনেক কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধ লক্ষণীয়। যেমন, নিম্নোক্ত চরণে কবিতায় রাসূল (সা:) ও আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়-

أحب محمدا حبا شديدا و عباسا و حمزة و الوصيا
أحبهم لحب الله حتى أجيء إذا بعثت على هوياء^{৫৫}

অর্থ: আমি মুহাম্মদ (সা:) কে প্রচণ্ড ভালোবাসি, আর আব্বাস, হামযা ও ওয়াসীকেও^{৫৬}, আমি তাদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি যেন কিয়ামতের দিন আমি আমার ভালবাসার ব্যক্তিদের সাথেই উঠতে পারি।

অপর আরেকটি কবিতায় সকল চাওয়া পাওয়া একমাত্র আল্লাহর নিকটই হওয়া উচিত- এই মর্ম তুলে ধরেন-

و إذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله و أحسن الأعمال
فليعطينك ما أراد بقدره فهو اللطيف لما أراد فعلا
إن العباد و شأنهم و أمورهم بيد الإله يقلب الأحوال^{৫৭}

^{৫৫} ড. শাওকী দ্বইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩১৮।

^{৫৬} শিয়া মতবাদে বিশ্বাসীগণ আলী (রা:) কে ‘ওয়াসী’ বলে থাকেন। আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী (রহ:) কে অনেক ঐতিহাসিক শিয়া বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। (ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫।)

^{৫৭} ড. শাওকী দ্বইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৭৪।

অর্থ: আমি মুহাম্মদ (সা:) কে প্রচণ্ড ভালোবাসি, আর আব্বাস, হামযা ও ওয়াসীকেও, আমি তাদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসি যেন কিয়ামতের দিন আমি আমার ভালবাসার ব্যক্তিদের সাথেই উঠতে পারি।

কবি জারীরের কবিতায় মী ভাবধারাইসলা

প্রখ্যাত উমাইয়া কবি জারীরের রচিত অনেক কবিতায় ইসলামী ভাবধারা লক্ষণীয়। তাঁর অসংখ্য কবিতায় আল্লাহর শান বর্ণনা, রাসূল (সা:) এর প্রশংসা, নেককার ব্যক্তিদের প্রশংসা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি উক্ত কবিতাগুলোর ভাষা ও বাক্যশৈলীতে কুরআনের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, রাসূল (সা:) এর প্রশংসায় তাঁর রচিত দুটি চরণ নিম্নরূপ:

صلى الملائكة الذين تخيروا و الصالحين عليك و الأبرار
و عليك من صلوات ربك كلما نصب الحجيج ملبيين و عاروا^{৫৮}

অর্থ: আপনার জন্য সালাত পাঠ করে মনোনীত ফেরেশতাগণ এবং সৎ ও নেককার লোকগণও।

আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক হাজীগণ যখনই চাদর

পরিহিত অবস্থায় আগমন করেন তখন।

কবি ফারায়দাকের কবিতায় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস

উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারায়দাকের রচিত অনেক কবিতায় ইসলামী ভাবধারা দৃশ্যমান হয়। যদিও তিনি খলিফার প্রশংসা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ‘নাক্বাইদ’ রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেই বেশি অবদান রেখেছেন, তদুপরি সেসব কবিতার মধ্যেও তার ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখেছেন। যেমন, খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিকের প্রশংসায় তাঁর রচিত দুটি চরণ নিম্নরূপ:

جعلت لأهل الأرض عدلا و رحمة و براء لآثار الجروح الكوالم
كما بعث الله النبي محمدا على فترة والناس مثل البهائم^{৫৯}

^{৫৮} জারীর ইবনে আতিয়া, দীওয়ানু জারীর, (মিসর: আল মাতবায়াতুল ইসলামিয়াহ, ১৩১৩ হিজরী), খ. ১, পৃ. ৭৪।

^{৫৯} জারীর ইবনে আতিয়া, দীওয়ানু জারীর, (মিসর: আল মাতবায়াতুল ইসলামিয়াহ, ১৩১৩ হিজরী), খ. ১, পৃ. ৭৪।

অর্থ: আপনাকে পৃথিবীর ন্যায়বিচার ও দয়ার প্রতীক এবং আহত ব্যক্তির আরোগ্যকারী বানানো হয়েছে, যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা নবী মুহাম্মদ (সা:) কে পাঠিয়েছিলেন এমন সময়ের জন্য, যখন মানুষের অবস্থা ছিল চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।

এ পংক্তিতে কবি খলিফার প্রশংসা করলেও একইসাথে আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (সা:) এর প্রতি তার বিশ্বাসও ফুটিয়ে তুলেছেন।

কবিতায় কুরআনের প্রভাব

আরবী কবিতায় পবিত্র কুরআনের প্রভাব রাসূল (সা:) এর যুগ থেকেই দৃশ্যমান। পরবর্তীতে এটি অনেক অমুসলিম কবির রচনায়ও দেখা যায়। উমাইয়া যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন আল আখতাল। তিনি ছিলেন খৃষ্টান। তার কোন কোন কবিতায় কুরআনের আয়াতের সরাসরি ব্যবহার দেখা যায়। নিম্নোক্ত চরণটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ:

فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كأنهم من بقايا أمة ذهبوا^{৬০}

অর্থ: অতঃপর তাদের পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতি ছাড়া আর কিছুই রইলো না। যেন তারা তাদের জাতির অবশিষ্টাংশ।

এ পংক্তির প্রথমাংশ সরাসরি পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ২৫ নং আয়াত থেকে গৃহীত। এই পংক্তিতে যেমন সরাসরি কুরআনের শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, একইভাবে অনেক কবিতায় কুরআনের আয়াতের বাক্যশৈলী ঠিক রেখে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করার উদাহরণও এ যুগে পরিলক্ষিত হয়। যেমন, খারিজী মতাদর্শের অনুসারী কবি তিরিম্মাহ ইবনে হাকীমের একটি কবিতায় কিয়ামতের দিন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বক্তব্য ফুটে উঠেছে:

يوم لا ينفع المخول ذا الثر وة خلانة ولا ولده^{৬১}

অর্থ: যেদিন অগাধ ধন-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির জন্য কাজে আসবে না তার বন্ধু-বান্ধব কিংবা সন্তান।

^{৬০} আল আখতাল, দীওয়ানুল আখতাল, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৪), পৃ. ৩৮।

^{৬১} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

উক্ত চরণটি পবিত্র কুরআনের সূরা শু'আরার ৮৭নং আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী রচিত।

সর্বোপরি, এ যুগের আরবী কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার ঘটলেও তা ছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগের তুলনায় কম। বরং এ সময়ে খলিফাদের সুদৃষ্টি কামনার জন্য কখনো প্রশংসা, প্রতিপক্ষের নিন্দা, বীরত্বগাঁথা, শোকগাঁথা ইত্যাদি কবিতার প্রসার বেশি ঘটে। পরবর্তীতে আব্বাসী যুগে আরবী কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার তরান্বিত হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আব্বাসী যুগ

আব্বাসী যুগের সময়কাল হল ১৩১ হি./৭৪৯ খৃ. থেকে ৬৫৬ হি./১২৫৮ খৃ. পর্যন্ত মোট ৫০৯ বছর।^{৬২} তবে সাহিত্যমানের বিবর্তন ও উত্থান-পতনের সময়কাল বিবেচনায় এ যুগটিকে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যবিশ্লেষকগণ ৪টি পর্বে ভাগ করেছেন।^{৬৩}

প্রথম পর্ব

এ পর্বের ব্যাপ্তি একশত বছর। ইসলামের ইতিহাসে আরবদের রাজনীতি ও সাহিত্যের স্বর্ণ যুগ বলা যায় এ সময়কালকে। কেবলমাত্র আল-মুতানাব্বী (৩০৩ হি.- ৩৫৪ হি./৯১৫-১৬-৯৬৫ খৃ.) ছাড়া আর প্রায় সকল খ্যাতিমান কবির আবির্ভাবই ঘটে এ সময়কালে।^{৬৪} এ সময়ে মুসলিম জাহানের সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলামী শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চা হয় এ সময়ে। অনারব ভাষায় রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য আরবীতে অনুবাদের মধ্য দিয়ে আরবগণ পরিচিত হন ভিন ভিন দেশী শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে। আর ‘আরবী কবিতাও এ সময় ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে একঝাঁক প্রতিভাধর ও খ্যাতিমান কবির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। যার মধ্যে বাশশার ইবনে বুরদ (৯৫ হি.-১৬৭ হি./৭১৪ খৃ.-৭৮৪ খৃ.), আবু নুওয়াস (১৪৬ হি.-১৯৮ হি./৭৬৩ খৃ.-৮১৪ খৃ.), আবুল ‘আতাহিয়া (১৩০ হি.-২১১ হি./ ৭৪৮ খৃ.-৮২৬ খৃ.) ও আবু তাম্মাম (মৃ. ২৩১ হি.) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।^{৬৫}

^{৬২} ড. হাসান আযিলী, *আল আদাব: নুসুসুহ ওয়া তারিখুহ*, (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা’আরিফ, ১৯৮১), পৃ. ৭।

^{৬৩} ড. আব্দুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা*, প্রাপ্তকৃত, পৃ. ১৮০।

^{৬৪} প্রাপ্তকৃত।

^{৬৫} প্রাপ্তকৃত।

দ্বিতীয় পর্ব

আব্বাসী যুগের এ অধ্যায়টি শুরু হয় ২৩২ হি. আল মুতাওয়াঙ্কিল ‘আল্লাহ-এর শাসন ক্ষমতা গ্রহণের মধ্য দিয়ে।^{৬৬} তিনি খিলাফতের রাজধানী দামিশকে স্থানান্তরের সংকল্প করেন। তার এ পদক্ষেপ কেবল আরবগণই সমর্থন করেন; কিন্তু পারস্য ও তুর্কীগণ এতে ক্ষিপ্ত হন। ফলে নিজের জীবন দিয়ে তিনি এ পদক্ষেপের কাফফারা দেন। তুর্কীগণ তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করে এবং স্বীয় উযীরসহ তাঁকে হত্যা করে। একে একে ১৩ জন খলীফা একই ধারায় আসেন এবং চলে যান। এখানেই সমাপ্তি ঘটে এ পর্বের। এ সময়কালে ক্ষমতার দ্রুত পালা বদলের ফলে শিল্প, সাহিত্যের তেমন একটা অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

তৃতীয় পর্ব

অতঃপর খিলাফতের পর্দায় হঠাৎ করে আগমন ঘটে পারস্যের বুওয়ায়হ বংশের। ৩৩৪ হি./৯৪৫ খৃ. থেকে সরকারী ও আনুষ্ঠানিক ভাবে বনু বুওয়ায়হ-এর নেতৃত্বে ‘আব্বাসী যুগ-এর তৃতীয় অধ্যায়ের শুরু হয়।^{৬৭} একে একে খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হন মু‘ইযযুদৌলাহ (৯১৫-৯৬৭ খৃ.), ‘ইযযুদৌলাহ, বখতিয়ার, ‘আযযুদৌলাহ (মৃ. ৩৭২ হি./ ৯৮৩ খৃ.), আবু নাসর বাহাউদৌলাহ (মৃ. ১০০২ খৃ.) তার দুই পুত্র সুলতানুদৌলাহ ও মুশরিফুদৌলাহ, অতপর বুওয়ায়হ বংশের সর্বাধিক দীর্ঘ মেয়াদী খলীফা আবু তাহির জালালুদৌলাহ (মৃ. ১০৪৪ খৃ.), আবু কালিজার এবং সবশেষে আবু নাসর আল-মালিকুর রাহীম। এর সাথে ৪৪৭ হিজরী সালে শেষ হয় বনু বুওয়ায়হ-এর শাসন এবং আব্বাসী যুগের তৃতীয় অধ্যায়।^{৬৮}

এ সময়কালটি ছিল বনু বুওয়ায়হ-এর যুগ বা পারস্যযুগ। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে খলীফাদের স্থায়িত্ব ছিল তাদের দাসদের হাতের মুঠোয়। তারাই যাকে ইচ্ছা খিলাফতে অধিষ্ঠিত করত, যাকে ইচ্ছা বরখাস্ত করত। কবি আল-মুতানাব্বী এর নাম রেখেছেন “দাস-সাম্রাজ্য”।^{৬৯} কাজের

^{৬৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১।

^{৬৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।

^{৬৮} প্রাগুক্ত।

^{৬৯} মো: রহিম উল্যাহ, আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও বৈশিষ্ট্য, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১, পৃ. ১৭২।

পরিবর্তে উপাধির বাড়িবাড়ি দেখা যায় এ সময়কালে। বুওয়ায়হগণ ছিল শী'আ মতাবলম্বী। তারা তাদের শী'আ মতবাদের প্রচার এবং আহলে সুন্নাহর বিরোধিতা করত। এ সময়কালে সাহিত্য সংস্কৃতির তেমন একটা উন্নতি সাধিত হয়নি। একমাত্র আল-মুতানাক্বী ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোন কবি এ সময়ে আবির্ভূত হয়নি।

চতুর্থ পর্ব

৪৪৭ হি. সালজুকীদের আগমনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আব্বাসী যুগের চতুর্থ অধ্যায়।^{৭০} তুর্কী বংশ এ সময় সালজুকীদের সাথে মিশে পশ্চিম এশীয় মুসলিম দেশসমূহের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। তারা এতদাধুনে ক্রুসেড যুদ্ধের মুখোমুখি হয়। আর খলীফাগণ ঐসব সালজুকীদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হন। মালিক শাহর মৃত্যুর পর শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। ফলে কেন্দ্রীয় সালজুকী শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। মালিক শাহ দৈর্ঘ্যে তুরক প্রান্তসীমার শহর কাশগর থেকে বায়তুল-মাকদিস পর্যন্ত এবং প্রস্থে কন্সটান্টিনোপল থেকে খারয় পর্যন্ত সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন।

এই সালজুকী যুগের শেষ ভাগে এসে ঘটে সেই বাগদাদ ট্রাজেডি। আহলে সুন্নাহ ও শী'আদের মধ্যে চলছিল চরম দ্বন্দ্ব। শী'আদের পবিত্র স্থান আল-কারখ আহলে সুন্নাহগণ ধ্বংস করে। তখন আব্বাসী খলীফা আল-মু'তাসিমের উযীর আল-'আলকামী আহলে সুন্নাহদের দমনের জন্য তাতার দলপতি হালাকু খানের^{৭১} সাথে যোগাযোগ করে এবং বাগদাদ দখলের জন্য তাকে প্ররোচিত করে। আর খলীফাকে ধোকা দেয়। অতপর হালাকু খান বাগদাদ দখল করে তার চরম ধ্বংস সাধন করে। চল্লিশ দিন পর্যন্ত ধ্বংসের তাণ্ডব অব্যাহত থাকে। ফোরাতে পানি নিহতদের রক্তে লাল হয়ে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাবলী নদীতে নিক্ষেপ করায় তার পানি থমকে দাঁড়ায়। এ ঘটনা তথা আব্বাসী যুগের এ সমাপ্তি ঘটে ১২৫৮ খৃ. সালে।^{৭২}

^{৭০} ড. আব্দুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ১৮২।

^{৭১} হালাকু খান (আনু. ১৮১২-১৮৬৫) ছিল একজন মঙ্গোলীয় সেনানায়ক। সে দূর্ধর্ষ তাতারী বাহিনীর প্রধান চেঙ্গিশ খানের নাতি। তার নেতৃত্বে তাতারীরা খলিফা মুসতা'সিম বিল্লাহর শাসনাধীন আব্বাসী খেলাফত ধ্বংস করে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিপুল ধ্বংসযজ্ঞ সাধন করে ১২৫৮ সালে তারা বাগদাদ দখল করে।

^{৭২} ড. হাসান আযিলী, *আল আদাব: নুসুসুহ ওয়া তারিখুহ*, প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭।

ইসলামী ভাবধারা ও আঙ্গিক বিশ্লেষণ

উপরিউক্ত চারটি পর্বের মধ্যে প্রথম পর্বই ইসলামী অনুশাসন পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত ছিল। তাই তখনকার সময়ে রচিত কবিতায় ইসলামী ভাবধারা বেশি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে আব্বাসী যুগের সূচনাই হয়েছিল ইসলামী চেতনা নিয়ে। আবুল ‘আব্বাস আস-সাফফাহ, ‘আবদুল্লাহ ইব্ন ‘আলী প্রমুখ তাদের প্রথম বক্তৃতাতেই তাদের রাজনৈতিক দর্শন, মৌলনীতি ও কর্মপন্থা তুলে ধরেন।^{৭৩} তন্মধ্যে ছিল:

১. তারা শর’ঈ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা রাসূল (স)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সূত্রে এসেছে। তারা ইরাক ও খুরাসানবাসীকে উমাইয়া নির্যাতন ও জুলুম থেকে সুবিচার প্রদান করতে বদ্ধপরিকর। এরই বিরাট প্রভাব ও প্রাধান্য পড়েছে তাদের সাহিত্যিক ও কাব্যিক গতিধারায়।

২. শাসন ক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা। এ সময়কালে রাজনীতিতে দীন ও দুনিয়াবী শাসন-এর সংমিশ্রণ ঘটেছিল। উত্তম ও নেককার লোকগণ দীনের অনুসরণ করত আর অন্যরা তাদের আনুগত্য করত। হয়তোবা ভয়ে নতুবা আগ্রহভরে।

এ সময়কার খলীফাগণ নব প্রতিষ্ঠিত খিলাফত নিষ্কণ্টক করণার্থে কিছুটা রুঢ় পদক্ষেপ নিলেও তাঁরা ছিলেন দীনদার ও সচ্চরিত্রবান। তবে কোন কোন সাহিত্যিক—যাদের পুরোভাগে রয়েছেন ড. তুহা হুসাইন, আব্বাসী যুগের প্রথম অধ্যায়টিকে খেল-তামাশা, ধর্মদ্রোহিতা ও পাপাচারের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।^{৭৪} এ ব্যাপারে তারা প্রমাণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন কোন কোন কবির খেল-তামাশা ও মদ বিষয়ক কবিতা। আর তার রেশ ধরে গোটা যুগটাকেই উক্ত বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।

কিন্তু আব্বাসী যুগের প্রথম অধ্যায়টাই ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইব্ন হামবাল (র)-এর ন্যায় খ্যাতিমান ‘আলিমের আবির্ভাব ঘটে। এ যুগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শীর্ষস্থান অধিকার করে। এ

^{৭৩} ড. আব্দুল জলীল, *আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩।

^{৭৪} প্রাগুক্ত।

সময়েই ইসলামী রাষ্ট্র সম্মানজনক স্থানে উপনীত হয় এবং ক্রুসেড যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনী মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়।^{৭৫} তাই ঢালাওভাবে উক্ত যুগকে পাপাচারের, ধর্মদ্রোহীতার যুগ বলে অভিহিত করা সঠিক নয়। এ সময়কার কবিতায় পাপাচারের কিছু চিত্র ফুটে উঠলেও তার বিরাট এক অংশ জুড়ে রয়েছে তাওহীদ, তাকওয়া, দুনিয়া বিরাগ এবং ইসলামের রীতিনীতি ও ইসলামী ভাবধারা। এ যুগের কবিতায় যে সকল বৈশিষ্ট্য পূর্বের যুগের চেয়ে আরো সমৃদ্ধ হয়ে দেখা দেয় সেগুলো হচ্ছে-

১. আল্লাহর একত্ববাদ ও তার প্রশংসা।

আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও তাওহীদের বিশ্বাসভিত্তিক অসংখ্য কবিতা এ যুগে রচিত হয়। যেগুলো ভাষাবিন্যাসের দিক থেকেও কুরআনের অনুসারী। উদাহরণ স্বরূপ- প্রখ্যাত কবি বাশশার ইবনে বুরদ (৭১৪-৭৮৪ খৃ.)^{৭৬} তাঁর একটি কবিতায় বলেন:

مولاك أكرم من تميم كلها أهل الأفعال و من قریش المشعر
فارجع إلى مولاك، غير مدافع سبحان مولاك الأجل الأكبر^{৭৭}

অর্থ: তোমার প্রভু তামীম গোত্রের যারা কর্তব্যাক্তি তাদের সকলের থেকে সম্মানিত এবং কুরাইশ দলের সকলের থেকেও। তাই তুমি তোমার প্রভুর দিকেই ফিরে যাও কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত। তোমার প্রভু সম্মানিত ও মহান।

এ যুগে ইসলামী সাহিত্যের আরেকজন উজ্জ্বল নক্ষত্র কবি আবুল আতাহিয়া (৭৪৮-৮২৬ খৃ.)

^{৭৮}। তাঁর অনেক কবিতায় আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন একটি কবিতায় তিনি বলেন:

^{৭৫} প্রাপ্ত।

^{৭৬} প্রখ্যাত আরব কবি। তিনি আব্বাসী যুগের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর কবিতার ভাষা ছিল খুবই প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। প্রশংসামূলক কবিতা রচনায় তিনি খুবই দক্ষ ছিলেন। এছাড়া প্রেমের কবিতা ব্যঙ্গ কবিতা, গৌরব গাঁথা ও শোক গাঁথা ইত্যাদিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। (মো: রহিম উল্যাহ, আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও বৈশিষ্ট্য, প্রাপ্ত, পৃ. ১৭২।)

^{৭৭} দীওয়ানু বাশশার ইবনে বুরদ, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১৯৯৩), খ. ৪, পৃ. ৬২।

^{৭৮} আব্বাসী যুগের বিখ্যাত কবি। তার প্রকৃত নাম ইসমাইল ইবনুল কাসিম ইবনে সুয়াইদ। উপনাম আবু ইসহাক এবং উপাধি আবুল আতাহিয়া। তিনি যুহদিয়াত তথা দুনিয়াবিমুখ কাব্য রচনায় অনন্য ছিলেন। (মো: রহিম উল্যাহ, আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও বৈশিষ্ট্য, প্রাপ্ত, পৃ. ১৭৫।)

فالسّر أجمع عنده إعلان
أبداً و ليس لغير السبحان^{৭৯}

سبحان من لا شيء يحجب علمه
سبحان من هو لا يزال مسبحاً

অর্থ: পবিত্র মহিমাময় তিনি, কোন কিছুই যার জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হতে পারেনা। তাই গোপন বিষয় তাঁর কাছে প্রকাশ্য হয়ে প্রতিভাত হয়। পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, সর্বদাই যার তাসবীহ পাঠ করা হয়, তিনি ব্যতিত আর কারোর জন্যই পবিত্রতা ঘোষণা করা হয় না।

২. তাওবা ও অনুতাপ।

এ যুগে ইসলামী সাহিত্যের বিকাশধারায় নতুনত্ব যোগ করে তাওবা ও অনুতাপমূলক কবিতা। বহু কবি কবিতার ভাষায় নিজের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমার প্রত্যাশা নিয়ে কবিতা রচনা করেন। যেমন, মদ ও নারী সংশ্লিষ্ট কবিতা রচয়িতা হিসেবে প্রসিদ্ধ আবু নুওয়াস^{৮০} তাওবার অনুভূতি প্রকাশ করেন নিম্নোক্ত চরণে-

أيا من ليس لي منه مجير
أنا العبد المقر بكل ذنب
بغفوك من عذابك أستجير
و أنت السيد المولى الغفور^{৮১}

অর্থ: ওগো সেই সত্তা!, যার থেকে আমাকে আশ্রয়দাতা কেউ নেই। তোমার ক্ষমার দ্বারা তোমার শাস্তি থেকে আমি পানাহ চাচ্ছি। আমি সকল পাপ স্বীকারকারী বান্দা। আর তুমি ক্ষমাকারী মহান প্রভু।

আরবী সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ‘দীওয়ানুল হামাসা’^{৮২}র সংকলক আবু তাম্মাম রচিত একাধিক কবিতায় অনুশোচনাবোধ লক্ষণীয়। পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতে কাফিরদের কথা

^{৭৯} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

^{৮০} তার প্রকৃত নাম হাসান। তিনি আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আরবীর পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু ফারসী কবিতাও রচনা করেন। তার কবিতায় নারী, মদ ইত্যাদি বেশি আলোচিত হলেও শেষ জীবনে তার রচনায় অনুতাপ লক্ষ্য করা যায়। (মো: রহিম উল্যাহ, আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮।)

^{৮১} ইয়াকুত আল হামাবী, মুজামুল উদাবা, (মিসর: মাতবাতাতুল হিনদিয়াহ, ১৯৩০), খ. ৬, পৃ. ২২০।

^{৮২} এটি একটি কাব্য সংকলন। এ সংকলনের কবিতাগুলো মূলত জাহিলী যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বগাঁথা। আব্বাসী যুগের অন্যতম উজ্জ্বল নস্কত্র আবু তাম্মাম এগুলো সংকলন করেন। (মো: রহিম উল্যাহ, আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও বৈশিষ্ট্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২।)

বলা হয়েছে যে, তারা কিয়ামতের দিন আফসোস করে বলবে, “হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম!”^{৮৩} এ ধরনের অনুশোচনাবোধ কাব্যের ভাষায় প্রকাশ করে আবু তাম্মাম বলেন:

فقد أنست بالموتى نفسي، لأنني
فيا ليتني من بعد موتي، و مبعثي
رأيت المنيا يختر من حياتيا
أكون رفاتا، لا على ولا ليا^{৮৪}

অর্থ: মৃত্যু দ্বারা আমার আত্মা শান্তি লাভ করেছে। কারণ, আমি দেখেছি যে মৃত্যু আমার জীবনের মূলোৎপাটন করে দেয়। হায়! মৃত্যুর এবং পুনরুত্থানের পর যদি আমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতাম, যার ফলে আমার লাভ বা ক্ষতি কিছুই হতো না।

৩. রাসূল (সা:) এর প্রতি ভালোবাসা।

এ যুগে রাসূল (সা:) এর প্রতি ভালবাসায় রচিত কবিতার সংখ্যা অপরিমেয়। ইতিহাসখ্যাত অসংখ্য কবি এ ধারার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ইলমে ফিকহের পথিকৃৎ ইমাম আবু হানীফা (রহ:)ও রাসূল (সা:) এর ভালবাসায় সিক্ত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি চরণ নিম্নরূপ:

و بحق جاهك إنني بك مغرم
أنت الذي لولاك ما خلق إمرؤ
و الله يعلم إنني أهواك
كلا ولا خلق الورى لولاك^{৮৫}

অর্থ: আপনার মর্যাদার কসম! আমি আপনার ভালবাসায় আবদ্ধ। আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালবাসি। আপনি এমন এক সত্তা, আপনার আবির্ভাব না হলে একজন মানুষও সৃষ্টি হতো না। কখনো না, আপনি না হলে জগতও সৃষ্টি হতো না।

এ যুগে দার্শনিক ধারার একজন উল্লেখযোগ্য কবি আবুল আ'লা মাজারী (৯৭৩-১০৫৭ খৃ.)^{৮৬} রাসূল (সা:) এর দাওয়াতী মিশনের প্রশংসায় বলেন,

^{৮৩} আল কুরআন, সূরা নাবা - ৪০।

^{৮৪} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১।

^{৮৫} প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩।

دعاكم إلى خير الأمور محمد و ليس العلى في القنا كالسوافل
 حداكم على تعظيم من خلق الضحى و شهب الدجى من طالعات
 وافل^{৮৭}

অর্থ: মুহাম্মদ (সা:) তোমাদেরকে সর্বোত্তম কাজের দিকে আহ্বান করছেন, আর বর্ষার উপরের অংশ নিচের অংশের মত নয় (অর্থাৎ তিনি কাজের আহ্বান করছেন, তার মর্যাদা অনেক উঁচু)। তিনি তোমাদেরকে পরিচালিত করেছেন সেই সত্তার সম্মান প্রদর্শনের দিকে, যিনি পূর্বাঙ্ক সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকারের উদীয়মান ও অস্তগামী তারকা সৃষ্টি করেছেন।

৪. দুনিয়া বিরাগ ও উপদেশমূলক কবিতা।

দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। মানুষের প্রকৃত গন্তব্য আখিরাত। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হওয়ার আহ্বান পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় এসেছে। আব্বাসী যুগের ইসলামী সাহিত্যের অগ্রনায়কগণ এ বিষয়েও অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। এমনই একজন ব্যক্তি ছিলেন প্রখ্যাত আধ্যাত্মিক সাধক ইবরাহীম বিন আদহাম (৭৩০-৭৭৮ খৃ.)।^{৮৬} সাহিত্যের ইতিহাসে তার মুষ্টিমেয় রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। তার কবিতার নির্দিষ্ট কোন দীওয়ান সংকলিত হয়নি। তার সীমাবদ্ধ রচনাবলির মধ্যে দুনিয়াবিমুখ হওয়ার মূল্যবান উপদেশ ফুটে উঠেছে নিম্নোক্ত চরণে-

نرفع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرفع
 فطوبى لعبد اثر الله ربه و جاد بدنياه لما يتقوع^{৮৭}

অর্থ: আমরা দুনিয়াকে ঠিক করছি আমাদের দ্বীনকে টুকরো টুকরো করে। তাই আমাদের দ্বীন আর অবশিষ্ট থাকছে না এবং আমরা যা ঠিক করছি তাও না (অর্থাৎ দুনিয়াও ঠিক থাকছে না)। সুতরাং, আনন্দ ও খুশি সেই বান্দার যে তার প্রতিপালক আল্লাহকে প্রাধান্য দিয়েছে ও দুনিয়ার দ্বারা সেই জিনিসকে উত্তম বানিয়েছে যার আকাজক্ষা করা হয় (অর্থাৎ আখিরাত)।

^{৮৬} আব্বাসী যুগের একজন দার্শনিক কবি। তার প্রকৃত নাম আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ। তিনি বাল্যকালে অসুস্থতাজনিত কারণে অন্ধ হয়ে যান। পরবর্তী জীবনে অধিকাংশ রচনায়ই তার নিজ জীবন নিয়ে নৈরাশ্য ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। তবে তার কবিতায় গভীর চিন্তাধারার ছাপ লক্ষণীয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭-২০)

^{৮৭} আবুল আ'লা মা'আররী, আল লুয়ুমিয়াত, (মিসর: মাতবাতুল জামালিয়াহ, ১৯১৫), খ. ১, পৃ. ১০৭।

^{৮৮} একজন খ্যাতিমান সুফী ও আবেদ। তিনি বলখের অধিবাসী ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তার সকল কবিতায়ই এর প্রভাব বিদ্যমান। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৮৭-৩৮৯)

^{৮৯} ড. আব্দুল জলীল, আরবী কবিতায় ইসলামী ভাবধারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

প্রখ্যাত ফকীহ ও হাদীস বিশারদ ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)^{৯০} আখিরাতকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়া প্রসঙ্গে মূল্যবান উপদেশমালা কাব্যের ভাষায় তুলে ধরেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি চরণ নিম্নরূপ:

أرى أناسا باد في الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا بالعيش بالدون
فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن
الدين^{৯১}

অর্থ: আমি বহু মানুষকে দেখেছি, তারা সামান্য দ্বীন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু দুনিয়ার ব্যাপারে তাদেরকে সামান্য নিয়ে সন্তুষ্ট হতে দেখছি না। সুতরাং, তুমি রাজা-বাদশাহদের দুনিয়া ছেড়ে দ্বীন গ্রহণ করে ধন্য হও যেভাবে রাজা-বাদশাহরা দ্বীন ছেড়ে দুনিয়া গ্রহণ করে ধন্য হয়।

^{৯০} ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এর অন্যতম ছাত্র। তিনি ১১৮ হিজরী/৭৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১ হিজরী/৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪)

^{৯১} ড. শাওকী দ্বইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪০৫।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আন্দালুসীয় যুগ

মুসলিম স্পেন তথা আন্দালুস ছিল মুসলিম ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের নাম। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের অন্যতম এক উদাহরণ ছিল আন্দালুস। তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বে সংঘটিত বিজয়ের মাধ্যমে যে সোনালী দিগন্তের উন্মোচন হয়েছিল সেখানে তা প্রায় দীর্ঘ ৮০০ বছর স্থায়ী ছিল।^{৯২} এ সময়কাল যেমন ছিল ইসলামের, মুসলিম রাজত্বের স্বর্ণযুগ, তেমনি একইভাবে শিল্প-সাহিত্যেরও স্বর্ণযুগ। আন্দালুসে যখন মুসলিম শাসনের যাত্রা শুরু হয় তখন প্রাচ্য আব্বাসী যুগের অধীনে। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষতা সেখানে বিরাজমান।

প্রাচ্যের অনেক মূল্যবান আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলী আন্দালুসের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত হতে থাকে। ব্যাপক হারে সেখানে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। আরবী সাহিত্যের অন্যান্য গতানুগতিক ধারার ন্যায় আন্দালুসেও বক্তৃতা, পত্র সাহিত্য, মাকামা, প্রণয় কাব্য, শোকগাঁথা, প্রশংসাগাঁথা, নিন্দামূলক কাব্য, বর্ণনামূলক কাব্যের ধারা সূচিত হয়। এরই পাশাপাশি আন্দালুসের কবিগণ তাঁদের নিজস্ব স্টাইলের কবিতাও আবিষ্কার করেন। এ নিজস্ব স্টাইল ছিল আল মুওয়াশশাহাত নামে পরিচিত এক বিশেষ ধরনের গীতিকবিতা।^{৯৩} আরবরা শুধু আন্দালুসে মুসলিম শাসন কায়েম ও আরবী সাহিত্যের যাত্রাই সূচনা করেনি, বরং সমগ্র ইউরোপই এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়।

পদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আন্দালুসের পদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশও আব্বাসী পদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে। একইভাবে তা প্রাচীন রূপ থেকে আধুনিক রূপে পরিবর্তিত হয়। ফলে

^{৯২} এস এম ইমামউদ্দিন, *মুসলিম স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং, ৫ম মুদ্রণ, ২০০৭), পৃ. ৩২।

^{৯৩} আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ আল আওয়াদ, *আশ-শিরকুল আন্দালুসী* (রিয়াদ: মাতাবি'উ বাহরিল উলুম, ১৯৮২), পৃ. ২৮০-২৮১।

আন্দালুসীয় পদ্যের ক্রমবিকাশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা: প্রাচীনপন্থী তথা সনাতনধর্মী, মুক্তধারা ও আধুনিক পদ্য।^{৯৪} সনাতনধর্মী পদ্য ছিল আন্দালুসের মুসলিম ইতিহাসের শুরুর দিকের তথা উমাইয়া শাসনামলের। ফলে আন্দালুসে আরবী কবিতার উৎপত্তির পরে দীর্ঘকাল যাবত তা সনাতনধর্মী থেকে যায়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত এ ধরনের কবিতার অস্তিত্ব টিকে থাকে।^{৯৫} এ ধারার পদ্য সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হচ্ছেন ইবন আদ্বি রাব্বিহ, ইবন হানী, ইবন শুহাইদ, ইবন দাররাজ প্রমুখ। তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের উমাইয়াদেরকে অনুসরণ করতেন। সনাতন রীতি থেকে বের হয়ে আসার প্রচেষ্টা শুরু হয় একাদশ শতক থেকে।^{৯৬} এর অন্যতম কারণ ছিল প্রাচ্যকে অনুসরণ করতে না চাওয়া এবং নিজ মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও নিজ প্রকৃতির টান। এর ফলে প্রাচীন রীতি থেকে মুক্ত পদ্যের জন্ম নেয়। এ ধারার কবি ছিলেন ইবন যায়দুন, ইবন আন্মার, মু'তামাদ ইবন আব্বাদ, ইবন হাদ্দাদ প্রমুখ।

কবিতায় কুরআনের প্রভাব

আন্দালুসের কবিতায় ইসলামী ভাবধারা লক্ষণীয়। বিশেষ করে বেশ কিছু কবির কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব দেখা যায়। এসব কবিতায় আল কুরআনের শব্দ, ঘটনা, ভাব ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত কবিরা তাঁদের কবিতা রচনায় আল কুরআন থেকে শব্দ চয়ন করেছেন, অনেক সময় কুরআনের কোন কোন পরিভাষার ব্যবহার করেছেন। আবার বিভিন্ন নবী-রাসুলের সময়ের ঘটনাবলী, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেগুলো আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে সেসব বিষয়ও তাঁরা কবিতায় তুলে এনেছেন।

যাদের কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁদের মধ্যে ইবনে যায়দুন ও ইবনে জাবের অন্যতম। তাঁদের রচিত গদ্য ও পদ্য উভয় শাখাতেই এ প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁদের রচিত সাহিত্য আল কুরআন কর্তৃক প্রভাবিত হওয়ার কারণ হিসেবে কুরআনের ব্যাপারে তাঁদের লব্ধ

^{৯৪} হাম্মা আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাপ্ত, পৃ. ৭৯৬।

^{৯৫} খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী, *মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্য: প্রকরণ ও শৈলী*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯, পৃ. ৫৬।

^{৯৬} প্রাপ্ত।

জ্ঞানকে চিহ্নিত করা হয়।^{৯৭} তাঁদের চিন্তা- চেতনা, ধ্যান- ধারণা আল কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ- ইবনে যায়দূনের একটি কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, তিনি একটি আয়াতের শব্দ ও ভাবার্থ হুবুহু বজায় রেখেই তা কবিতায় ব্যবহার করেছেন। যেমন-

يا صاحب المال ألم تستمع لقوله ما عندكم ينفد
فاعمل به خيرا فو الله يبقي ولا أنت به مخلص^{৯৮}

অর্থ: হে সম্পদের মালিক! তুমি কি তাঁর বাণী শুনোনি? তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তা দিয়ে ভাল কাজ কর, আল্লাহর শপথ, তা রয়ে যাবে, আর তুমি এর দ্বারা চিরস্থায়ী নও।

উক্ত পঙক্তিতে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বক্তব্য ফুটে উঠেছে-

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ^{৯৯}

অর্থ: তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী।

একইভাবে ইবনে জাবেরের একটি কবিতায় কুরআনের আয়াতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

بهم عاش في أم القرى هالك و هم أوقدوا نار القرى لمن استهدى^{১০০}

অর্থ: প্রত্যেক ধ্বংসপ্রাপ্ত (যারা) উন্মূল কুরায় বসবাস করেছে এবং সত্য পথের অনুসন্ধানীদের আবাসে আগুন লাগিয়েছে।

উক্ত পঙক্তিতে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বক্তব্য ফুটে উঠেছে-

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ^{১০১}

অর্থ: তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী।

^{৯৭} প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

^{৯৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

^{৯৯} আল কুরআন, সূরা নাহল - ৯৬।

^{১০০} খোন্দকার নূরুল একা উম্মে হানী, মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্য: প্রকরণ ও শৈলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

^{১০১} আল কুরআন, সূরা মায়িদাহ - ৬৪।

আন্দালুসীয় যুগে আরবী কবিতার ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ভিন্ন ভূখণ্ড ও ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব কবিতার ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান হয়। অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করে। মূলত, স্পেনে দীর্ঘকালের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মত সাহিত্য রচনার ধারাও নানা পরিবর্তনের সাক্ষী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উসমানী যুগ

উসমানী যুগে আরবী কবিতার ইতিহাস তেমন সমৃদ্ধ ছিল না। এ সময়কাল অনেক ঐতিহাসিকের মতেই পতনযুগ হিসেবে বিবেচিত।^{১০২} এ সময়ের কবিতাগুলোর শৈল্পিক সৌন্দর্য তেমন বিকাশ লাভ করেনি। গদ্য সাহিত্যের অবস্থান এ সময়ে তুলনামূলক ভাল ছিল।

এ যুগে আরবী কাব্যের বিকাশ না ঘটায় অন্যতম কারণ, তুর্কী সাম্রাজ্য কর্তৃক মামলুকদের পরাজিত করার পর বহু সাহিত্য উপকরণ ধ্বংস করা। সে সময়ে তুর্কী ভাষার আধিপত্য তৈরির প্রচেষ্টার অংশ হিসেবেই মূলত পরাজিত মামলুকদের বহু সাহিত্য উপকরণ ধ্বংস করা হয়, যার প্রভাব উসমানী সাম্রাজ্যে বরাবরই বিরাজমান ছিল।^{১০৩}

সর্বোপরি সাহিত্যে রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত ইসলামী শিক্ষার উপাদানসমৃদ্ধ কাব্যও এ যুগে বিরল। এ যুগের মুষ্টিমেয় কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শিহাব আল খাফফাযী (মৃত্যু ১০৬৯হি.), ইবনে মানজিক (মৃত্যু ১০৮০হি.) এবং আব্দুল্লাহ আশ-শাবরাওবী। এদের মধ্যে আব্দুল্লাহ আশ-শাবরাওবীর কবিতায় রাসূল (সা:) ও আহলে বাইতের প্রশংসা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, তাঁর রচিত একটি পঙক্তি নিম্নরূপ-

بيتكم مهبط الرسالة والوحي و منكم نور النبوة يبدو^{১০৪}

অর্থ: তোমাদের ঘর রিসালাত ও ওহীর ক্ষেত্র, এবং তোমাদের থেকেই নবুওয়াতের নূর সূচিত হয়েছে।

^{১০২} ড. হাসসান হাল্লাক সম্পা., আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আদাবিল আরাবি, (বৈরুত: দারু ইহইয়াইল উলুম, ১৯৯৪), পৃ. ৫০২।

^{১০৩} শাওকী দ্বইফ, তারিখুল আদাবিল আরাবী, প্রাপ্ত, পৃ. ৩১০।

^{১০৪} মো: মাহফুজুল করিম, আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২, পৃ. ১৭১।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিদ্যমান সংঘাতমূলক ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এ যুগে আরবী সাহিত্যের পতন দেখা গেলেও পরবর্তীতে মিশর থেকেই জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণের পাশাপাশি আরবী কবিতাও নতুন প্রাণ ফিরে পায়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ

১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর ১৭৯৮ সালে (১২১৩ হি:) নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বৎসরের এ পরিসরে ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকজন কবি সাহিত্যিকের সীমিত অবদান ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এ সময় কবিতায় সৃষ্টি হয়নি নতুন কিছু, মননশীল কাব্যচর্চা এ সময় আদৌ ব্যাপকতা লাভ করেনি, সাহিত্য সমালোচকগণ এ সময়কে পতনের যুগ (আসরুল ইনহিতাত) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ সময়ে স্পেনের মুসলিম শাসন এবং তুরস্কে উসমানী খিলাফত বজায় থাকলেও আব্বাসী যুগের মত আরবী সাহিত্যে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। কাব্য রচনার ধারা একপ্রকার গতিহীন থেকে যায়। তবে তাতারীদের আঘাতে আরব জাহান বিধ্বস্ত হওয়ার পরও মিশর, হিন্দুস্তান ও উসমানী খেলাফতের অধীনস্থ অঞ্চলে মুসলিমদের জ্ঞান চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল। আরবী কবিতার অগ্রগতি তেমন না হলেও ইসলামী দর্শন, ইতিহাস, অভিধানশাস্ত্র, আরবী ব্যাকরণ ও অলংকার ইত্যাদি বিষয়ে বিশাল কলেবরে অনেক জ্ঞানগর্ভ রচনা এ যুগে সম্পন্ন হয়েছিল।

এরপর আধুনিক যুগের সূচনাকাল থেকে অদ্যাবধি আরবী কাব্য অভাবনীয় বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আলোচ্য অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রথম পরিচ্ছেদে আধুনিক যুগের সূচনাকাল, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ যুগের আরবী কবিতায় বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি, এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইসলামী শিক্ষার উপাদানের প্রসারে উল্লেখযোগ্য কবিদের অবদান সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরবী সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা

নেপোলিয়নের মিসর বিজয়ে রাজনৈতিক অবস্থা যে রকমই হোক না কেন এর ফলে আরবী ভাষা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা সম্ভাবনা পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইউরোপের সঙ্গে নতুনভাবে আরববিশ্বের পরিচয় ঘটে। ফরাসিরা এখানে দুটি শিক্ষা নিকেতন স্থাপন করে। প্রকাশ করে আল আশুর আল-মিশরী ও আল তানবীয়াহ নামে দুটি পত্রিকা, আর নাটক মঞ্চায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করে নাট্যশালা। জ্ঞানচর্চার জন্য একাডেমী ও গ্রন্থাগার। পুস্তকাদি মুদ্রণের জন্য স্থাপন করে প্রেস।^{১০৫} এ সবের প্রভাবে জেগে উঠে মিশরের সাহিত্য-সংস্কৃতির নিদ্রিত অঙ্গন।

আধুনিক আরবী কবিতার ক্রমবিকাশ

প্রখ্যাত বাংলা সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসান সাহিত্যের আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে বলেন,

নতুন সময়ে এবং নতুন চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন গতানুগতিক রীতিই পূর্বভাবের অনুষঙ্গে ভারাক্রান্ত। তাই নতুন তাৎপর্যে তা কখনো বহমান হতে পারে না। এছাড়া মানুষ প্রতিমূহর্তে তার স্বভাব অনুসারে এবং সাময়িক অবস্থার শাসনে একটি বিশিষ্ট প্রকাশরীতি আবিষ্কারের জন্য উৎকর্ষিত থাকে। পূর্বতন রীতি মানুষের বর্তমান অবস্থার পরিচয়কে প্রকাশ করতে সাধারণতঃ সক্ষম হয় না। আমরা তাই দেখি যে কবিতা বা চিত্রকলার ভাব বৈলক্ষ্যের সংগে সংগে শিল্প পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে।^{১০৬}

আরবী কাব্য এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাচীন রচনা শৈলীর নিগড় ভেঙ্গে আরবী কবিতা বৈচিত্র্যময় নতুন ধারার দিকে ধাবিত হয়েছে ক্রমশঃ। আরবী কবিতায় আধুনিক ধারার বিকাশকে দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়।

^{১০৫} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, তারিখুল আদাবিল আরাবি, (বৈরুত: দারুশ শারকীল আরাবী, ২০০৬), পৃ. ৪১৬।

^{১০৬} সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে, (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৪১৬।

১. প্রথম পর্যায়, প্রাচীন রীতির অনুসরণ ও নবজাগরণ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবী কাব্য উসমানী যুগের রচনারীতি থেকে মুক্ত না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে কবিতার উপস্থাপন পদ্ধতিতে কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়। আরবরা ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আরবী সাহিত্যে নতুনত্ব আনয়নে সচেষ্ট হয়। এ সময় জাহিলী ও আব্বাসী যুগের প্রসিদ্ধ দীওয়ানসমূহ পুনঃমুদ্রিত হয়। প্রাচীন রীতিকে সামনে রেখে নতুন রূপে নতুন ধাঁচে কবিতা লিখতে শুরু করে এ সময়ের কবিরা। রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে পুরাতন ধারা দৃশ্যমান হলেও রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ও ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে কবিতায় নতুনত্বের ছোয়া লাগে।

অন্যদিকে ১৮৮২ সালে ইংরেজদের হামলা ও প্রভুত্বের কারনে আরবী কবিতায় ধ্বনিত হয় বিদ্রোহের সুর। বিখ্যাত সংস্কারক জামালুদ্দীন আফগানী ১৮৭১ সাল থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত মিসরে অবস্থান করেন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য এক সাংস্কার আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। তার প্রভাবে আরবী কবিদের মনে ব্যক্তিস্বত্তা, জাতীয় অনুভূতি ও সমাজ সচেতনতা স্থান পায়।^{১০৭} তার সংস্কার আন্দোলনে মিসরের যে সকল কবি অংশ নেন তাদের মধ্যে আল-বারুদী (১৮৩৯-১৯০৪ খৃ.) অন্যতম। কবিতায় নতুন ধারা নির্মাণের ক্ষেত্রে তার অবদান অনস্বীকার্য। তাকে আধুনিকতার পতাকা উত্তোলনকালী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আহমদ হাসান আয-যয়্যাতের মতে ‘কসীদা’ রীতিতে যদি ইমরুউল কায়েস অনন্য আর কবিতা, উন্নতি ও সৌন্দর্য বিধানে যদি বাশশার একক কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে কবিতায় জাগরণ ও নবায়নের ক্ষেত্রে আল-বারুদীর কৃতিত্ব একক ও অনন্য।^{১০৮} বাক্যশিল্পের ক্ষেত্রে আল-বারুদীর দুই ধরনের ভূমিকা লক্ষ্যণীয় :

ক. প্রাচীন রীতির পুনর্জাগরণ।

খ. স্ততিগাঁথা ও রোজগার করার উপায় থেকে কবিতাকে মুক্তি দান।

^{১০৭} জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, (মিসর: মাতবা’আতুল হিলাল, ১৯১১), পৃ. ৬৪২।

^{১০৮} আহমদ হাসান যাইয়্যাতে, *প্রাপ্ত*, পৃ. ৪৯৩।

আল-বারুদী রেনেসাঁ যুগের প্রথম পর্যায়ের কবি। এজন্য কবিতার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি আধুনিক এবং ভাষা ও রচনারীতির দিক দিয়ে প্রাচীন। তিনি পুরাতন রীতির অনুসারী হলেও একেবারে অন্ধ আনুগত্য করেননি। তিনি জীবন ও জগৎকে নিজস্ব দৃষ্টিতে দেখেন। তার কাব্যমালায় তার সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের চিত্র অংকিত হয়েছে। মূলতঃ বারুদীই প্রথম প্রধান কবি যার কবিতার আরশীতে আধুনিকতা ঝলমল করে উঠে।^{১০৯} আল-বারুদীর কাব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্যের মূল ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য রচনা নীতির প্রাচীন কাঠামো ভেঙ্গে দেননি, বরং তিনি পুরাতন রীতির পুনর্জাগরণ করে তাতে নতুন কলাকৌশল ও সৌন্দর্যের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।^{১১০}

এ পর্যায়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আধুনিক আরবী সাহিত্যের কবিসম্রাট আহমদ শাওকী। তিনি একজন শক্তিশালী নাট্যকারও। তিনি একাধারে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, ধর্ম, দেশপ্রেম, প্রসংশা, শোক, প্রকৃতি ইত্যাদি বিষয়াদির উপর কাব্য রচনা করেছেন। চার খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর দীওয়ান আরবী কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। শাওকী অনেকটা আল-বারুদীর মতই পুরাতন রীতিতে নতুন ভাব ও বিষয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটিছেন। কবিতা রচনায় তিনি আব্বাসীয় যুগের আল-মুতানাব্বীর দ্বারা প্রভাবিত হলেও ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব অনস্বীকার্য।^{১১১} তার কাব্যচর্চা ও সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আরবী সাহিত্যে এক সোনালী অধ্যায় যুক্ত হয়। তিনি গ্রীক ও আরব কাব্য প্রতিভা জন্ম সূত্রেই প্রাপ্ত হন। আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন কবিদের রচনা তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ক্লাসিক্যাল আরবী কাব্য, বিশেষ করে আব্বাসীয় যুগের কাব্য অধ্যয়ন ও চর্চার ফলে তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ ও বিভিন্ন জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির সাথে পরিচয় তার অভিজ্ঞতা ও ভাব-কল্পনাগুলোকে বিকশিত করে।

^{১০৯} শাওকী দ্বইফ, *আল আদাবুল আরাবিয়াল মু'আসির ফি মিসর*, (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১০ম সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ৯৩।

^{১১০} প্রাপ্ত, পৃ. ১৭৩।

^{১১১} ড. হাসান শায়িলী ফারহুদ, *আল আদাব ওয়ান নুসুস*, (রিয়াদ: ওয়াযারাতুল মা'আরিফ, ১৯৮১), পৃ. ১৩২।

তিনি আরবী সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেন তেমনি বিশ্ব সাহিত্য দরবারে আরবী ভাষার মর্যাদাকে সমুল্লত করেন। তিনি অসংখ্য কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ এবং শিশু সাহিত্য রচনা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি পাশ্চাত্যের কাব্যরীতির আদলে আরবী কাব্যঙ্গনে নাট্যকাব্যের ধারা সংযোজন করেন। দিন দিন আরবী সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার প্রতিভার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। আহমদ শাওকী রচিত কাব্যনাট্য এ যুগের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্যারিসের আধুনিক নাট্যশালায় প্রচুর নাটক দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে শাওকীর। আহমদ শাওকী একজন শক্তিশালী কবি। তিনি রচনারীতির দিক দিয়ে প্রাচীন আর ভাব ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আধুনিক।

এ সময়ের আরেকজন কবি, যার কাব্যে দেশপ্রেম ও নবজাগরণের সুর ধ্বনিত, তিনি হলেন হাফিজ ইবরাহীম (১৮৭০-১৯৩২ খ্রিঃ)। তার কাব্যে প্রচুর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবহুল বিষয়বস্তু তার কবিতার প্রধান উপজীব্য।^{১১২} হাফিজ তার কবিতার উন্নতি লগ্নে ঘনিষ্ঠভাবে মিসরীয় জনগনের অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেন। তার কবিতায় দেশপ্রেম, স্বজাত্যবোধ ও বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হওয়ায় তিনি “শাইরুন নাইল” বা “নীল নদের কবি” হিসেবে সমাদৃত হন।^{১১৩}

এ পর্যায়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন ইরাকের মারুফ রুসাফী (১৮৭৩-১৯৪৫ খ্রিঃ)। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার ছিল অবাধ বিচরণ। সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর শোচনীয় জীবন চিত্র তার কবিতার মূল প্রাণ। উম্মুল-ইয়াতীম (অনাথ-জননী), আল-ইয়াতীম ফিল-ঈদ, (ঈদের দিনে অনাথ), আল-ইয়াতিমুল-মাখদু (প্রতারিত অনাথ), আস-সিজনু ফী বাগদাদ (বাগদাদের কারাগার), আল-মুতাল্লাকা (তলাকপ্রাপ্তা) ইত্যাদি শিরোনামে রচিত কবিতাগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রুসাফী স্ততি, ব্যঙ্গ, কৌতুক, প্রেম, শোকগাথা, গৌরবগাথা, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে কবিতা লিখেছেন। তবে লক্ষ্যনীয় যে, রাজনীতি ও সামাজিক কবিতার ক্ষেত্রে রুসাফীর

^{১১২} ড. শাওকী দ্বইফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

^{১১৩} প্রাগুক্ত।

স্বকীয়তা সার্থকভাবে প্রতিফলিত।^{১১৪} অন্যক্ষেেে তিনি গতানুগতিক রীতিতে বিচরণ করেছেন। এ ভাবে আল-বারুদী, আহমদ শাওকী ও তাদের অনুসরণকারী সমকালীন অন্যান্য কবিদের প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা গতানুগতিক নিগড় ভেঙ্গে যে সকল বিষয়বস্তু দিয়ে সমৃদ্ধ হয়, সেগুলো হলো-

১. দেশাত্মবোধক
২. জাতীয়তাবাদ
৩. জাগরণমূলক
৪. সামাজিক
৫. ধর্মীয়
৬. প্রকৃতি বিষয়ক
৭. স্ততিমূলক
৮. শোকগাঁথা ইত্যাদি।^{১১৫}

^{১১৪} আনওয়ার আল জুনদী, *আদওয়াউন 'আলাল আদাবিল আরাবিয়্যল মু'আসির*, (কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৮), পৃ. ১৪১।

^{১১৫} প্রাপ্ত।

২. দ্বিতীয় পর্যায়, নবায়ন

বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নেই এমন একদল কবির আবির্ভাব ঘটলো যারা কবিতার শরীর থেকে প্রাচীন আবরণ খুলে নতুন আভরণে সুসজ্জিত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৯০০ সালে প্রকাশিত ‘আল মাজাল্লাতুল মিসরীয়াহ’ নামক পত্রিকার মাধ্যমে খলীল মুতরান আপামর আরবী কবিদের উদাত্ত আহ্বান জানান যেন কবিতাকে প্রাচীন রীতির বন্ধ প্রকোষ্ট থেকে মুক্ত করা হয়। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত তাঁর দীওয়ানে এ আহ্বান আরও স্পষ্ট। তাঁকে অনুসরণ করে কবিতা লিখেন আবদুর রহমান শুকরী (১৮৮৬-১৯৫৮), ইব্রাহীম আল-মাযিনী (১৮৯০-১৯৪৯) ও আব্বাস মাহমুদ আল-আক্বাদ (১৮৮৯-১৯৬৪) প্রমুখ কবিরা। বস্তুত আরবী কবিতা নবায়নের ক্ষেত্রে এ চার কবির কাব্য আন্দোলন যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।^{১১৬}

১২৫৮ সালে আব্বাসীয় যুগের পতনের পর ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৫৪০ বৎসর আরবী কাব্যে যে বন্ধ্যাত্ব নেমেছিল তা দূর হয় আধুনিক যুগের কবিদের অনবদ্য প্রচেষ্টায়। তাদের লক্ষ্য ছিল প্রাচীন বা গতানুগতিক রীতি থেকে মুক্ত করে আরবী কবিতাকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় কাব্যের মর্যাদায় উন্নীত করা। তাদের শৈল্পিক চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টায় আরবী কবিতা ক্রমে নতুনরূপে সজ্জিত হয় এবং নতুন ভাবধারায় অলংকৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

^{১১৬} Haywood, Jhon A., *Modern Arabic Literature (1800-1970)*, (London: Lund Humphries, 1971), p. 97.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আধুনিক আরবী সাহিত্যে বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধি

আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারায় আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তন আসে। জাহিলী যুগ থেকে রেনেসাঁর পূর্বযুগ পর্যন্ত এক ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রেনেসাঁর পর আধুনিক আরবী কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাবধারা সমৃদ্ধি লাভ করে। এ সময় কবিতাও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠে। কবি মাহমুদ সামী আল বারুদীর আত্মপ্রকাশের পর কবিতা নতুন বৈশিষ্ট্য পরিগ্রহ করে। তিনি কবিতায় আব্বাসীয় রচনারীতির অনুকরণ করলেও ভাব ও বিষয়ে নতুনত্ব নিয়ে আসেন। তিনি আধুনিক আবিষ্কার, ইতিহাস ঐতিহ্য কবিতায় তুলে ধরেন। তার কাব্যধারায় কবিতা নতুন রূপে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। নিম্নে আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনসমূহ উল্লেখ করা হলো:

- আধুনিক আরবী কবিতায় প্রাচীন কবিতার বিষয়াবলী যেমন প্রশংসা, নিন্দা, শোকগাঁথা, গুণকীর্তন, প্রণয়মূলক, গৌরবগাঁথা, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ইত্যাদি স্থান পেয়েছে তবে তাতে বাক্যশৈলীগত সমৃদ্ধি এসেছে। তাছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, শিক্ষামূলক কবিতা, দেশাত্মবোধ, দেশের প্রতি অনুরাগ, ইত্যাদি উদ্দেশ্যে কবিতা রচিত হয়েছে।^{১১৭}
- ব্যক্তি গৌরবগাঁথা পরিত্যাগ করে দেশ ও জাতির প্রতি অনুরাগ জাগ্রত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক দোষত্রুটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছে। এভাবে কবিতায় স্বাধীনতা লাভের প্রতি আগ্রহের কথা ব্যক্ত হয়েছে।
- একক বিষয়ে কবিতা ও একক বিষয়ে কাব্য সংকলন বা দীওয়ান প্রকাশিত হয়েছে।

^{১১৭} আহমদ কাক্বিশ, *ফি তারিখিশ শি'রিল আরাবিয়িল হাদীস*, (বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.), পৃ. ৭৫১।

- কবিতা একক কাফিয়া থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত কবিতা, ছন্দবিহীন কবিতা ও গদ্য কবিতায় রূপ নিয়েছে।^{১১৮}
- কবিতার ওজনে নতুনত্ব এসেছে। কবি বারুদী এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি উনিশ বয়সে বিশিষ্ট কবিতা রচনা করেন ছন্দে। কবি আহমদ শাওকীও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একই ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন।^{১১৯}
- প্রহসন জাতীয় কবিতার প্রসার লাভ ঘটেছে। এক্ষেত্রে ইলিয়া আবু মাদী এবং সাফী তাজফীর নাম উল্লেখযোগ্য।
- বিভিন্ন ভুল ত্রুটির ব্যাপারে আত্মার সহানুভূতি আধুনিক আরবী কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। যেমন: কবি মাহমুদ হাছান ইসমাঈল ক্ষুধা দারিদ্রের জন্য বিদ্রোহী হওয়ার অভিযোগ পেশ করেছেন।^{১২০}
- আধুনিক কবিতায় প্রতীকীবাদ কবিতার সৃষ্টি। এটি কবিতায় নতুন বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে। প্রতীকীবাদী কবি সম্প্রদায় এ জাতীয় কবিতায় মার্জিত শব্দরূপ, ভাবের বৈচিত্র্যতা ও কাল্পনিক চিত্রের মাধ্যমে মনোভাব ফুটিয়ে তুলতেন। তারা হলেন মিসরের আবু শাদী, সিরিয়ার তিয়ার কুবানী, লেবাননের সালাহ আমীর, মাহজারী কবি ইলিয়া আবু মাদী।^{১২১}
- পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণে আধুনিক আরবী কবিতায় পরাবাস্তববাদী কবিতার উদ্ভব। এ ধারার কবিতা রচয়িতার মধ্যে রয়েছেন: কামিল আমীন, জাওরজ হোসাইন, কামিল জুহায়রী এবং ফুয়াদ কামিল অন্যতম।^{১২২}

^{১১৮} ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *খাসাইসু শিরিল আরাবিয়াল হাদীস*, (বৈরুত: দারুল ফিকরিল আরাবী, তা.বি.), ৩৩।

^{১১৯} মো: মাহফুজুল করীম, *আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২, পৃ. ২৪৭।

^{১২০} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮।

^{১২১} ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *খাসাইসু শিরিল আরাবিয়াল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১-৫৭।

^{১২২} মো: মাহফুজুল করীম, *আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯।

- আধুনিক আরবী কবিতায় প্রেমকাব্য বৈষয়িকতার উর্ধ্বে উঠে অনেক জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে। প্রাচীন কবিতায় নারীদের রূপ, সৌন্দর্য বর্ণনায় অনেকটা অশ্লীলতার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। আধুনিক কবিতায় তা থেকে কবিতা মুক্ত।
- কাহিনীমূলক কবিতা আধুনিক আরবী কবিতায় অনন্য বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে।
- নাট্য কবিতা আধুনিক আরবী কবিতার এক নতুন উদ্ভাবন। যা আরবী কবিতাকে নতুনভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। কবিসম্রাট আহমদ শাওকীর হাতে এ কবিতার উত্থান। তার নাট্যকাব্য বিষয়বস্তুর দিক থেকে ক্লাসিক ধারার। তিনি নাট্যকাব্যে স্থান, কাল, পাত্র ও বিষয়গত ঐক্যের বাধ্যবাধকতা মানেননি। যে নিয়ম ফরাসী নাট্যকাব্যে মানা হয়েছে। তিনি ফরাসী ও ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে আযীয আবাজা এ ক্ষেত্রে অবদান রাখেন।^{১২৩}
- প্রাচীন কবিতায় অলংকারিক অতিরঞ্জন, কঠিন শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক কবিতা তা থেকে মুক্ত। আধুনিক কবির মনস্তাত্ত্বিক বিকাশ, দৃষ্টির পরিচ্ছন্নতা ও সহজীকরণ প্রবণতা কবিতায় দৃশ্যমান।^{১২৪}
- হরেক রকম বিষয় ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা আধুনিক আরবী কবিতার অনুপম বৈশিষ্ট্য। যেমন: দার্শনিক চিন্তাধারা মূলক কবিতা, শিক্ষামূলক কবিতা।
- মাহজারী কবিদের কবিতার অনন্য গতিধারা আধুনিক আরবী কবিতার বৈশিষ্ট্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে। পাশ্চাত্য কবিতার সাথে আধুনিক কবিতার মেলবন্ধন পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনার প্রভাবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে।^{১২৫}
- আধুনিক আরবী কবিতায় ইসলামী চিন্তাধারার আলোকে কবিতা রচিত হয়েছে। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াত মূলক কবিতা। এক্ষেত্রে কবিসম্রাট আহমদ শাওকী, হাফিজ ইব্রাহীম,

^{১২৩} ড. নু'মাত আহমদ ফুয়াদ, *খাসাইসু শিরিল আরাবিয়াল হাদীস*, প্রাপ্ত, পৃ. ৬৭-৬৯।

^{১২৪} প্রাপ্ত, পৃ. ৫১।

^{১২৫} প্রাপ্ত, পৃ. ৭৩-৭৮।

আহমদ মুহাররম, মাহমুদ গুণাইম, মারুফ রুসাফী, মুহম্মদ হাসান আওয়াদ, ইব্রাহীম গায়ওয়াবী, হাসান আল কুরশী, মাহমুদ আরেফ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।^{১২৬}

আধুনিক আরবী সাহিত্যে এ পরিবর্তনগুলো আরবী সাহিত্যকে করেছে আরো সমৃদ্ধ। এ নতুন ও সমৃদ্ধ ধারায় উল্লেখযোগ্য অন্তর্ভুক্তি ইসলামী কবিতা। পরবর্তী পরিচ্ছেদে কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

^{১২৬} মো: মাহফুজুল করীম, *আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা*, প্রাপ্ত, পৃ. ২৪৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আধুনিক যুগে আরবী সাহিত্যের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। পাশাপাশি এটিও আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে যে, আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ইসলামী সাহিত্য। বলাবাহুল্য, যেসব অগ্রনায়কের হাত ধরে আধুনিক আরবী কবিতা নতুনত্ব ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে, তারা সকলেই ছিলেন ইসলামী ভাবধারার কবি। এ যুগের কবিতার বিকাশধারার যে দুটি দিক পূর্বে আলোচিত হয়েছে, ইসলামী কাব্যগুলোকে বিশ্লেষণ করলেও এ দুটি দিক দৃশ্যমান হয়। অর্থাৎ, একটি হচ্ছে- পূর্বের ধারা অনুসৃত কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের সংযোগ এবং অপরটি হচ্ছে- আরবী সাহিত্যে নব-উদ্ভাবিত ধারার কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার। এ পরিচ্ছেদে উভয় ধারার উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ পেশ করা হয়েছে।

১. পূর্বের অনুসৃত ধারার কাব্যে ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

আধুনিক যুগের কবিগণ অনেক ক্ষেত্রে জাহিলী যুগ থেকে আব্বাসী যুগ পর্যন্ত আরবী কাব্যের গতানুগতিক ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলো অর্থাৎ প্রশংসা, নিন্দা, গৌরবগাঁথা, শোকগাঁথা, প্রণয়গীতি, হিজা বা ব্যঙ্গাত্মক, ওয়াসফ বা বর্ণনামূলক কবিতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষাগত ব্যবহারের নবায়ন ও তাতে ইসলামী মূল্যবোধের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। এ ধরনের কবিতার কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ-

প্রশংসামূলক কবিতা

প্রশংসাসূচক কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে এ যুগের কবিরা অনেকাংশেই ইসলামী যুগের অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ, জাহিলী, উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগে প্রশংসাসূচক কাব্যগুলোতে যে অতিরঞ্জন লক্ষ্য করা যায় তার পরিবর্তে আধুনিক কবিগণ ইসলামী যুগের মত সহজবোধ্য বাক্যশৈলী ও বাস্তবমুখী প্রশংসা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন, খুলাফায়ে রাশেদীনের

অন্যতম হজরত আলী (রা:) এর প্রশংসায় কবি মাহমুদ সামী আল বারুদী হিজরতের প্রাক্কালের ঘটনা তুলে ধরে বলেন-

نادى عليا فأوصاه وقال له لا تخش والبس ردائي أمنا ونم
ومر با لقوم يتلو وهو منصرف ليس وهي شفاء النفس من
وصم^{১২৭}

অর্থ: তিনি (রাসূল সা:) আলী (রা:)কে ডাকলেন এবং আমানতের সকল সম্পদ মালিকদের নিকট বুঝিয়ে দেওয়ার আদেশ করলেন। এবং বললেন, ভয় পেয়োনা! আমার চাদর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়। অতঃপর তিনি কুরআন পাঠরত অবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, কিন্তু তারা দেখতে সক্ষম হয়নি।

উক্ত কবিতায় কবি রাসূল (সা:) এর প্রতি আলী (রা:) এর আনুগত্যের কথা তুলে ধরেছেন। এতে তিনি বাস্তব বিবর্জিত কাল্পনিক কোন প্রশংসা করেননি। আবার উচ্চমার্গের আলংকারিক বর্ণনার আশ্রয়ও নেননি।

প্রশংসাসূচক কবিতার ক্ষেত্রে আরো লক্ষণীয় যে, পূর্বের যুগগুলোতে শুধুমাত্র ব্যক্তির প্রশংসায়ই কবিতা রচনা বেশি হতো। এ যুগে ব্যক্তির পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিকও অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, কবি আহমদ শাওকী আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসায় বলেন-

قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانثر على سمع الزمان الجواهر
واجعل مكان الدر ان فصلته في مدحه خرز السماء النير^{১২৮}

অর্থ: উঠে দাঁড়াও! এবং দুনিয়াব্যাপী যার প্রশংসা সেই আযহারের দিকে অগ্রসর হও। সময়ের প্রতিতে ছড়িয়ে দাও আযহারের মণি, জহরত। যদি তুমি উহার সাথে মিলিতি হও তবে মনি মুক্তার স্থানকে আপন করে নাও। কেননা উহার প্রশংসায় আলোকময় জ্যোতিষ্ক আসমান থেকে ঝরে পড়ছে।

^{১২৭} মাহমুদ সামী আল বারুদী, কাশফুল গুম্মাহ, (কায়রো: মাতবাআ'তুল জারিদাহ, ১৯০৯), পৃ. ২০।

^{১২৮} মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন হুসাইন, আল আদাবুল হাদীস, (রিয়াদ: দারু আদিল আজিজ আস সুলাইমান, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৭৮), খ. ১ পৃ. ২৭।

আধুনিক যুগে প্রশংসাসূচক কাব্যের উন্নতি ও বিকাশ ঘটেছে সুস্পষ্টভাবে। প্রশংসা কেবল সাহসিকতা, বীরত্ব ও বদান্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, আধুনিক যুগে তা দেশপ্রেম, দেশের জনগণের অধিকার রক্ষা ও জনসেবার মত ইত্যাদি গুণাবলী যা জাতীয় নেতৃত্বদ ও সংগ্রামী মানুষের বৈশিষ্ট্য, তাও একীভূত করে নিয়েছে। প্রশংসিত ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু প্রাপ্তির আশায় কবিতা রচনার ধারা আধুনিক যুগে দেখা যায়না। বিশেষত এ যুগে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর প্রশংসামূলক কবিতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ যুগে আহমদ শাওকী, হাফিজ ইবরাহীম, আহমাদ মুহাররম প্রমুখ কবিরা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।^{১২৯}

শোকগাঁথা

শোকগাঁথা আরবী কবিতার একটি প্রাচীন দিক। বিষয়টি আধুনিক যুগেও বিদ্যমান। তবে পূর্বের শোকগাঁথাগুলোতে আবেগতাড়িত দুঃখ প্রকাশ বেশি ঘটতো। এ যুগে শোকগাঁথায় মৃত ব্যক্তির গুণাবলী ও তার সম্মান, মর্যাদা, ইত্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।^{১৩০} কবিগণ জ্ঞানী গুণী, নেতৃত্বদ, নিকট আত্মীয়দের শোকগাঁথা রচনা করেছেন। যেমনিভাবে আধুনিক যুগে শহর নগর এবং রাষ্ট্র নিয়েও শোকগাঁথা রচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা স্পেনের নাম উল্লেখ করতে পারি। আহমদ ন ওশাওকী স্পে তুরস্কের বিভিন্ন শহর, তুর্কী খেলাফত সম্পর্কে শোকগাঁথা রচনা করেছেন। স্পেনকে নিয়ে তাঁর রচিত শোকগাঁথার প্রথম দুই চরণ নিম্নরূপ:

يا نائح الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أم نأسى لوادينا
ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا^{১৩১}

অর্থ: হে আমাদের উপত্যকার বৃষ্টির ফোঁটার মত বিলাপকারী, আমরা কি তোমার উপত্যকার জন্য আকুল হব, নাকি ভুলে যাব? আমাদেরকে আর কী বলবে? যে হাত তোমার ডানা ভেঙ্গে আমাদের চারপাশে বিচরণ করছে, তা ব্যতিত?

^{১২৯} মো: মাহফুজুল করিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮।

^{১৩০} ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, *মিন আদাবিনাল মু'আসির*, (কায়রো: মাতবা'আতুল ফাজরিল জাদীদ, ১৯৮০), পৃ. ৪৭।

^{১৩১} আহমদ শাওকী, *আশ শাওকীয়াত*, (মিসর: মুয়াসসাসাতু হিনদাতী, ২০১২), পৃ. ১২৫৭

ব্যক্তি বিশেষের জন্য রচিত শোকগাঁথাগুলোর মধ্যে হাফিজ ইবাহীম রচিত বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক ইমাম মুহাম্মদ আবদুহ (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) এর স্মরণে লিখিত কবিতা অন্যতম।
উদাহরণ স্বরূপ কবিতাটির দুটি পংক্তি নিম্নরূপ:

وَقَفْتُ عَلَيْهِ حَاسِرَ الرَّأْسِ خَاشِعًا كَأَنِّي حِيَالِ الْقَبْرِ فِي عِرْفَاتِ
لَقَدْ جَهِلُوا قَدْرَ الْإِمَامِ فَأُودِعُوا تَجَالِيدَهُ فِي مُوحِشٍ بِقَلَاةٍ^{১৩২}

অর্থ: আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থাকি খালি মাথায় বিনয়ের সাথে, যেন আমি আরাফাতের কবরের নিকট দাঁড়িয়ে আছি। তারা ইমামের কাজের ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, ফলে তারা তাঁর কাজগুলোকে নির্জন জায়গায় জমা করেছিল।

বীরত্বগাঁথা

গৌরব ও বীরত্বগাঁথা আরবী কবিতার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই উদ্দেশ্যে কবিগণ পূর্বে কবিতা রচনা করেছেন। আধুনিক যুগে কবিগণ আরব জাতি, আরব মুসলিমদের গৌরব ও মুসলিম বীর মুজাহিদদের বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করেছেন। আহমদ মুহররাম, শাওকী, বারুদীর কবিতায় এসব বীরত্বগাঁথার বর্ণনা পাওয়া যায়। আধুনিক যুগে এই বিষয় বৃহত্তর নতুন ভাষাশৈলীতে আবর্তিত হয়েছে। কবি মাহমুদ সামী আল বারুদীর এ জাতীয় কবিতার একটি চরণ নিম্নরূপ:

إِذَا اسْتَلَّ مِنَّا سَيِّدُ غَرْبٍ سَيْفِهِ تَفَزَّعْتَ الْإِفْلَاقُ وَالتَّفَتُّ الدَّهْرُ^{১৩৩}

অর্থ: যখন আমাদের নেতা তেজস্বী রূপে তরবারির কোষ উন্মুক্ত করে ভূমণ্ডল ভয়ে কেঁপে উঠে এবং যুগ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

২. নতুন ধারার কাব্যে ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

আধুনিক যুগে কাব্য রচনার ধারায় রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, শিক্ষামূলক কবিতা, দেশাত্মবোধ, দেশের প্রতি অনুরাগ, ইত্যাদি নতুন বিষয়ের আবির্ভাব ঘটে এবং সে সব কবিতায়

^{১৩২} হাফিজ ইবরাহীম, *দীওয়ানু হাফিজ ইবরাহীম*, (মিসর: মুয়াসসাসাতু হিনদাতী, ২০১২), পৃ. ২৪১।

^{১৩৩} মুহাম্মদ বিন সাদ বিন হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

নতুন ভাষাশৈলীর মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরনের কবিতার উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ নিম্নরূপ:

রাজনীতি ও দেশাত্মবোধ

ফিলিস্তীন, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, লেবানন অঞ্চলগুলো যখন উপনিবেশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল, তখন আরব কবিরা তাদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিজয়ের গৌরবগাঁথা কবিতায় চিত্রিত করে তাদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিতেন। নিজেদের ভূমি থেকে উপনিবেশবাদীদের বিতাড়িত করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য যোদ্ধাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। যেমন ইরাকের কবি মারুফ আর রুসাফী তাঁর **الوطن والجهاد** কবিতায় বলেন,

يا قومُ إِنَّ العِداَّ قد هاجموا الوطنَ فانضوا الصَّوَارِمَ واحموا الأهلَ
والسكنا
واستنفروا لعدوِّ الله كلَّ فتى ممن نأى في أقاصي أَرْضِكُمْ وَدَنَا
واستنهضوا من بني الإسلام قاطبةً من يسكن البدو والأرياف
والمَدُنَا
واستقتلوا في سبيل الذود عن وَطَنٍ به تقيمون دين الله والسُّنَنَا^{১৩৪}

অর্থ: “হে আমার স্বদেশবাসী! শত্রু আমাদের মাতৃভূমির উপর আক্রমণ করেছে। সুতরাং তোমরা অসি কোষমুক্ত কর, পরিবার-পরিজন ও দেশবাসীকে রক্ষা কর। প্রত্যেক যুবকের উচিত, আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রেরিয়ে পড়া। সে তোমাদের দেশের দূরবর্তী অঞ্চলে থাকুক কিংবা দূরে। ইসলামের সন্তানগন! তোমরা একসাথে সবাই উঠে দাড়াও। যারা মরুভূমি, গ্রামে ও শহরে- যেখানেই থাকনা কেন। দেশ থেকে শত্রু তাড়াতে সাহস ও বীরত্ব দেখাও। যে দেশে তোমরা আল্লাহর দীন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করবে।

সামাজিকতা

আধুনিক যুগের কবিতার উল্লেখযোগ্য একটি দিক সামাজিকতা। কবিগণ তাদের কবিতায় যে সামাজিক বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তা হল, সামাজিক জীবনের চিত্র, সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা

^{১৩৪} মারুফ রুসাফী, *দীওয়ানু মা'রুফ আর রুসাফী*, (মিসর: মুয়াসসাসাতু হিনদাভী, ২০১৪), পৃ. ৭০৯।

সমাধানের কর্মপন্থা। এ যুগে আরব বিশ্বে সমাজ-সংস্কারমূলক বিভিন্ন সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সমাজের বহুমুখী সংস্কার। কবিগণ এসব সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাথে একিভূত হন। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের অগ্রনায়ক হয়ে কাজ করেন। কবিগণ এসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মক্ষেত্র ও মানবিক সেবামূলক কর্মকাণ্ড সুন্দর ও সার্থকভাবে কবিতায় তুলে ধরেছেন।

এ সময়ে মানুষের সবচাইতে বড় সমস্যা ছিল অভাব অনটন। সমাজ সচেতন ও সমাজ সেবী ব্যক্তিগণের পাশাপাশি কবি-সাহিত্যিকগণও কবিতা রচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করেছেন। তাদের রচিত কবিতায় আরব সমাজের সমস্যার স্বরূপ, কারণ ও প্রতিকারের কথা বলেছেন। তারা অভাবী মানুষের কষ্ট, দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ, এ যুগের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে অভাবী পরিবার থেকে বেড়ে উঠা কবি হাফিজ ইবরাহীমের কবিতার কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

مَا بَيْنَ ذَلِّ وَإِغْتِرَابِ رَقِهَا وَمَغْرِبِهَا اضْطِرَابِ رَأْسِي وَجَوْفِي وَالْوِطَابِ ذِكْرِ تَنَاسَاهُ الصِّحَابِ وَالْبُؤْسُ تَرْنِيحَ الشَّرَابِ ^{১৩৫}	قَضَيْتُ عَهْدَ حَدَائِثِي لَمْ يُغْنِ عَنِّي بَيْنَ مَشِ صَفَرَتِ يَدِي فَحَوَى لَهَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِي سِوَى أَمْشِي يُرَاحُنِي الْأَسَى
---	---

অর্থ: আমি আমার শৈশব কাটিয়েছি অপমানের মধ্যে প্রবাসী হিসেবে। পূর্ব-পশ্চিমে আমার অস্থিরতা কখনও দূর হয়নি। আমার হাত শূন্য হয়ে পড়েছে আর সে জন্য আমার মাথা, পেট ও থলিও শূন্য হয়েছে। আমার পরিবারের কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিছু স্মৃতি ছাড়া, যা ভুলে যাওয়ার ভান করে বন্ধুরা। আমি যখন চলি দুঃখ-কষ্ট আমাকে গান শোনায়। আর দুর্ভাগ্য শোনায় মদ পানের আসরের গান।

শিক্ষা

আধুনিক যুগের কবিগণ শিক্ষাব্যবস্থাকে কাব্য রচনার একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ যুগের কবিদের ভাবনা সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ

^{১৩৫} হাফিজ ইবরাহীম, দীওয়ান হাফিজ ইবরাহীম, প্রাপ্তক, পৃ. ১৬০।

ভূমিকা পালন করেছে। মাহমুদ সামী আল বারুদী, মারুফ রুসাফী, আহমদ শাওকী, হাফিজ ইবরাহীম, আহমদ মুহাররম প্রমুখ এ বিষয়ে কলম ধরেছেন। মারুফ রুসাফী স্বয়ং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর রচিত “التربية و الأمهات” (শিক্ষা ও মাতৃত্ব) এ ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এর কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

إِذَا سُقِيَتْ بِمَاءِ الْمَكْرُمَاتِ	هِيَ الْأَخْلَاقُ تَنْبُتُ كَالنَّبَاتِ
عَلَى سَاقِ الْفَضِيلَةِ مُثْمِرَاتِ	تَقُومُ إِذَا تَعَهَّدَهَا الْمُرَبِّي
كَمَا اتَّسَقَتْ أَنْابِيْبُ الْقَنَاءِ	وَتَسْمُو لِلْمَكَارِمِ بِاتِّسَاقِ
رُوحًا بِأَرْهَارٍ لَهَا	وَتُنْعَشُ مِنْ صَمِيمِ الْمَجْدِ
مُتَضَوِّعَاتِ	
يُهْدَبُّهَا كَحِضْنِ	وَلَمْ أَرَ لِلْخَلَائِقِ مِنْ مَجَلٍّ
بِتَرْبِيَةِ الْبَنِينَ أَوْ	الْأُمَمَاتِ
	فَحِضْنُ الْأُمِّ مَدْرَسَةٌ تَسَامَتْ
	الْبَنَاتِ ١٣٦

অর্থ: ভালো চরিত্র যখন মহৎ কর্মের মাধ্যমে জলে সিদ্ধিত হয়, তখন গাছের মতো বেড়ে ওঠে। শিক্ষকের দ্বারা লালিত হলে এটি বিকশিত হয়, সদ্ব্যুৎপাদনের কাণ্ডে ফল ধরে। এবং এটি নিখুঁত সামঞ্জস্যের সাথে মহৎ গুণাবলীতে উদ্ভিত হয়, ঠিক যেমন একটি খালের পাইপগুলি নিখুঁতভাবে সারিবদ্ধ থাকে। এবং এটি গৌরবের হৃদয় থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়, ফুলে ফুটে ওঠা একটি আত্মা। তার একটি সুবাস আছে এবং আমি মানবজাতির জন্য এমন কোনও স্থান দেখিনি যা মায়েদের আলিঙ্গনের মতো তাদের পরিমার্জিত করে। কারণ মায়ের আলিঙ্গন হল এমন একটি বিদ্যালয় যা পুত্র বা কন্যার লালন-পালনে উচ্ছে উঠে এসেছে

নারী অধিকার

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নারীশিক্ষা একটি অপরিহার্য দিক। ব্যক্তিগত ও মৌলিক শিক্ষা অর্জন করার পরও যদি কোন নারী অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মানসিক যোগ্যতার অধিকারী হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উচ্চশিক্ষা লাভ করতে চায়, তাহলে ইসলামী শরী‘য়ত তাকে সব ধরনের

১৩৬ মারুফ রুসাফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৫।

শিক্ষার অনুমতি দিয়েছে। ইসলামে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বর্ণযুগেই। কিন্তু আধুনিক যুগে এসে নারীরা সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে তাদের শিক্ষাগত অধিকারের ক্ষেত্রে। তাই এ যুগের কবিরা এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছে। কবি আহমদ শাওকীর কবিতার একটি উদাহরণ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন:

وجد المساعِدَ غيرُكم وحرمتُم في مصرَ عونَ الأمهاتِ جليلا
وإذا النساءُ نشأنَ في أُمِّيَّةٍ رضعَ الرجالُ جهالةً وخمولا^{১৩৭}

অর্থ: তোমাদের ছাড়াই সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তবে তোমরা (মিশরের মাতৃকুলকে)
সুশিক্ষিত করার সহযোগিতা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত করেছ। যদি নারীরা নিরক্ষরতা নিয়ে বড়
হয় তখন পুরুষরাও অজ্ঞতা ও মূর্খতার মাঝে লালিত পালিত হয়।

যুবসমাজের প্রতি সচেতনতা

যুব সমাজের সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা। সমাজ সংস্কারক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে যা ভাবিয়ে তোলে। তারা এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে যুব সমাজকে মুক্ত করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। আধুনিক আরবী কবিতায় যুবসমাজের সমস্যা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা যায়। যেমন, কবি আহমদ মুহাররম বলেন,

ذهب العصر الذي شبينا وأرى عصر الشباب الملحين
عبرونا أن عبدنا ربنا وحفظنا عهده في الحافظين^{১৩৮}

অর্থ: যে যুগ চলে গেছে, যা আমাদেরকে বৃদ্ধ করেছে। এখন আমরা দেখছি নাস্তিক যুবকদের
যুগ। তারা আমাদেরকে এ কারণে লজ্জিত করে যে, আমরা আমাদের রবের ইবাদত করি ও তাঁর
অঙ্গীকার পূরণ করি।

^{১৩৭} আহমদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬।

^{১৩৮} ড. মুস্তফা মাহমুদ ইউনুস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

শিশুতোষ কবিতা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শৈশব-কৈশরই হচ্ছে শিক্ষার ভিত্তিকাল। স্বচ্ছ মেধা, সুস্থ বুদ্ধি, সরল চিন্তা ও স্পষ্ট মনোযোগের কারণে শিশুরা সহজেই সবকিছু আয়ত্ত করতে পারে। ফলে আধুনিক যুগে শিশুদের জন্য সহজবোধ্য সাহিত্য রচনার মাধ্যমে শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিশুদের মাঝে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রতকরণে এ যুগের কবিগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও কুদরত অনুধাবনে কবি মারুফ রুসাফী রচিত শিশুদের জন্য ‘الله’ (আল্লাহ) কবিতা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এর কয়েকটি চরণ নিম্নরূপ:

انظر لتلك الشجرة	ذات الغصون النضرة
كيف نمت من حبة	وكيف صارت شجرة
فانظر وقل من ذا الذي	يخرج منها الثمرة
ذاك هو الله الذي	أنعمه منهمرة ^{১৩৯}

অর্থ: তাজা ডালবিশিষ্ট ঐ গাছের দিকে তাকাও। (এবং ভাবো) কীভাবে এটি একটি বীজ থেকে বেড়ে ওঠে এবং কীভাবে এটি একটি গাছে পরিণত হয়? তাই দেখে বলো, কে তা থেকে ফল উৎপন্ন করেন? সেই আল্লাহ, যার নিয়ামত বর্ষিত হচ্ছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমূলক কবিতা আধুনিক যুগের উল্লেখযোগ্য আরেকটি দিক। এ যুগে প্রকৃতিপ্রেমে রচিত কবিতাগুলোর মধ্যেও একাধিক ধারা লক্ষ্য করা যায়। অনেক কবিই রোমান্টিসিজমের সাথে প্রকৃতিপ্রেমের সংযোগ ঘটিয়েছেন, আবার অনেকেই নিছক কল্পনাশ্রিত কবিতা হিসেবেই প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। তবে ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত কবিদের মধ্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও তাঁর কুদরতের মহিমা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কবি আহমদ শাওকী বলেন,

تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري

^{১৩৯} মারুফ রুসাফী, প্রাপ্তকৃত, পৃ. ৭৬৫।

الأرض حولك و السماء اهتزنا
من كل ناطقة الجلال كأنها
دلت على ملك الملوك فلم تدع
لروايتو الآيات والآثار
أم الكتاب على لسان القاري
لا ذلة الفقهاء والأجساد^{১৪০}

অর্থ: ঐ মনোরম প্রকৃতি কতই না সুন্দর। হে সারেং, তুমি আমাদের নিয়ে একটু থামো। যেন আমি তোমাকে স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাতে পারি। তোমার চারপাশের নিদর্শনাবলির দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী আন্দোলিত হচ্ছে। এর প্রত্যেকেই আল্লাহর মহিমা এমনভাবে ব্যক্ত করছে, যেন তা ক্রারীর কণ্ঠে আল কুরআনের ধ্বনি। এগুলো বাদশাহদের বাদশার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। সুতরাং, পণ্ডিত ও বিবেকবানদের জন্য আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

^{১৪০} আহমদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

চতুর্থ অধ্যায়

ড. নাজিব আল কিলানীর পরিচয় ও সাহিত্যকর্ম

ড. নাজিব আল-কিলানি ছিলেন আধুনিক আরবি ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লেখক, যার সাহিত্যিক রচনাগুলো ইসলামি আদর্শ, সামাজিক বাস্তবতা এবং ঐতিহাসিক চেতনার সমন্বয়ে সমৃদ্ধ। তার সাহিত্যকর্মের মধ্যে উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা রয়েছে, যা কেবল শিল্পের অনুশীলন নয়, বরং ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আল-কিলানির সাহিত্য বাস্তবধর্মী এবং সমাজের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে। তার রচনাগুলো সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট এবং ঈমানের পরীক্ষাকে গভীরভাবে উপস্থাপন করে। তিনি মুসলিম সমাজের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সংকটকে তুলে ধরেছেন, যা পাঠকের চিন্তা ও চেতনায় গভীর প্রভাব ফেলে।

তার রচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইসলামী মূল্যবোধের প্রাধান্য। তিনি মানব চরিত্রের আত্মশুদ্ধি, ন্যায়বিচার, ঈমানের শক্তি এবং ইসলামের সামাজিক আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তার সাহিত্য পাঠকের নৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করে।

তিনি শুধু ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক সমস্যার চিত্রায়ন করেননি, বরং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস, রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তার রচনায় ঐতিহাসিক ঘটনা ও ইসলামি সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো শিল্পিতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

আলোচ্য অধ্যায়ে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নাজিব আল-কিলানি ১৯৩১ সালের জুন মাসে মিশরের আল-গারবিয়াহ জেলার শারশাবা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।^{১৪১} হিজরি হিসেবে এটি ১৩৫০ হিজরির সময়কাল। তাঁর পিতার নাম ইবরাহীম ইবন আবদুল লতীফ আল-কিলানি এবং মাতার নাম ছিল সাযিয়াদা ফাতিমা। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার প্রথম সন্তান। তাছাড়া তাঁর দুই ছোট ভাই ছিল, যাদের নাম আমীন ও মুহাম্মদ।^{১৪২}

শারশাবা গ্রাম এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলো ছিল প্রধানত কৃষিপ্রধান। বিশেষ করে তুলাচাষ ছিল ঐ এলাকার মানুষের প্রধান পেশা। তাঁর পিতা ইব্রাহীমও একজন কৃষক ছিলেন। যদিও তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি, তবুও তিনি ছিলেন বাস্তববাদী ও জীবন সম্পর্কে গভীর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি। তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারী, যা তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যত জীবন গঠনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে।^{১৪৩}

শৈশব ও পারিবারিক পরিবেশ

নাজিব আল-কিলানি তাঁর শৈশবকাল শারশাবা গ্রামেই কাটান। গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠার ফলে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও কৃষিজীবনের কঠোর বাস্তবতা সম্পর্কে গভীরভাবে অবগত হন। তাঁর পরিবার ছিল ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা একটি ধর্মপ্রাণ পরিবার। ছোটবেলা থেকেই তিনি পিতার কাছ থেকে সততা, পরিশ্রম ও ধৈর্যশীলতার শিক্ষা গ্রহণ করেন।

^{১৪১} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, *আল ইত্তিজাহ আল ইসলামী ফি আ'মালি নাজিব আল কিলানী* (রিয়াদ: আল মাহরজান আছ-ছাক্বাফী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী), পৃ. ১১।

^{১৪২} নাজিব আল কিলানী, *লামহাত মিন হায়াতী* (বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), খ. ১, পৃ. ২১।

^{১৪৩} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, প্রাগুক্ত।

পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, কারণ কৃষিকাজ করে সীমিত আয় হতো। তা সত্ত্বেও তাঁর পিতা চেষ্টা করতেন সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা দেওয়ার জন্য। নাজিবের মা ছিলেন একজন স্নেহশীল ও ধার্মিক নারী, যিনি তাঁর সন্তানদের ইসলামী অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।^{১৪৪}

শৈশবে যুদ্ধের অভিঘাত

নাজিব যখন মাত্র ১২ বছর বয়সী, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) শুরু হয়।^{১৪৫} এই যুদ্ধ মিশরের কৃষক সমাজের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। যুদ্ধকালীন সময়ে খাদ্যসংকট, অর্থনৈতিক দুর্দশা এবং সামাজিক অস্থিরতা নাজিবের পরিবারের মতো অন্যান্য কৃষক পরিবারেও তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। পরিবারের এই বিপর্যয় ছোট নাজিবের মন-মানসিকতায় গভীর ছাপ ফেলে।

যুদ্ধের কারণে নাজিবের পরিবারকে প্রচুর কষ্ট সহ্য করতে হয়। খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থনৈতিক চাপে গ্রামবাসী দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেই নাজিব বড় হতে থাকেন, যা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনচিন্তা ও ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।^{১৪৬} পরবর্তীকালে দেখা যায়, জীবনের যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে তিনি এক অবিচল মানসিকতা বজায় রেখেছেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, আত্মনির্ভরশীল এবং সংকট মোকাবিলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধের এই অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যেও প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে তিনি সমাজের দুর্দশা, অবিচার ও সংগ্রামী চেতনার কথা তুলে ধরেছেন।

^{১৪৪} প্রাপ্ত।

^{১৪৫} নাজিব আল কিলানী, *লামহাত মিন হায়াতী*, প্রাপ্ত।

^{১৪৬} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাপ্ত, পৃ. ২০৩।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিক্ষাজীবন

শিক্ষা জীবনের শুরু

যদিও তাঁর পিতা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করতে পারেননি, তবে তিনি সন্তানের শিক্ষার বিষয়ে ছিলেন সচেতন। গ্রামের মজুবে নাজিব প্রাথমিকভাবে কুরআন শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শৈশবেই কুরআন হিফজ সম্পন্ন করেন।^{১৪৭} এই ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি সাধারণ শিক্ষায়ও মনোযোগী ছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষায় তাঁর মেধার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন একজন অনুসন্ধিৎসু ও মেধাবী ছাত্র, যিনি কেবল বইপাঠে সীমাবদ্ধ থাকতেন না, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনে আগ্রহী ছিলেন। স্কুলজীবনে তিনি সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং আরবি ভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।^{১৪৮}

চার বছর বয়সে শিশু নাজিব তাঁর গ্রামের কুত্তাব বা পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করেন। সেখানে তিনি আরবি বর্ণমালার পরিচয়সহ পড়া, লেখা ও অংকের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি আল-কুরআনের কিছু অংশও পাঠ করেন।^{১৪৯} সাত বছর বয়সে গ্রামের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তখন থেকে সকালে কুত্তাবে যেতেন এবং দুপুরে যেতেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞানস্পৃহা দেখে তাঁর পিতামহ ইব্রাহীম তাঁকে জ্ঞানার্জনের প্রতি সব সময় উৎসাহ দিতেন।^{১৫০}

^{১৪৭} নাজিব আল কিলানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

^{১৪৮} প্রাগুক্ত।

^{১৪৯} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫।

^{১৫০} প্রাগুক্ত।

আট বছর বয়সে তাঁকে পার্শ্ববর্তী সানবাত গ্রামের আমেরিকান মিশনারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়।^{১৫১} এক বছর পর অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। অতঃপর তিনি যুফতী নগরীর কাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে তাঁর অবস্থান বেশিদিন হয়নি। তারপর তিনি তানতার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখানে পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর মাধ্যমিক স্তরের পড়ালেখা শেষ করেন।^{১৫২}

১৯৫১ খৃ. সনে তিনি জামি'আতু ফুয়াদ আল-আওয়াল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।^{১৫৩} অবশ্য তাঁর ইচ্ছা ছিলো কলা অথবা আইন শাস্ত্র অধ্যয়নের। কিন্তু নিজের ইচ্ছার উপর পিতার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেন। তিনি যখন ৪র্থ বর্ষের ছাত্র তখন মিসরের ইসলামিক রাজনৈতিক সংগঠন “জামা'আতুল ইখওয়ান আল-মুসলিমীন”-এর সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে ১৯৫৫ খৃ. সনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।^{১৫৪} বিচারে অভিযুক্ত হয়ে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চার বছর পর ১৯৫৯ খৃ. সনে স্বাস্থ্যগত কারণে জেল থেকে তিনি মুক্তি লাভ করেন এবং ১৯৬০ খৃ. সনে এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভের মাধ্যমে পড়াশুনা শেষ করেন।

^{১৫১} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

^{১৫২} প্রাগুক্ত।

^{১৫৩} প্রাগুক্ত।

^{১৫৪} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কর্মজীবন

কর্মজীবনের সূচনা

ড. নাজিব আল-কিলানি একজন প্রভাবশালী আরবি সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। স্নাতক সম্পন্ন করার পর তিনি মিসর সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে এবং রেলওয়ের স্বাস্থ্য বিভাগে চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন।^{১৫৫} এ সময় তিনি চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হয়। তাঁর লেখা ‘হিকায়াতু তাবীব’ (একজন চিকিৎসকের কাহিনী) মূলত তাঁর এই অভিজ্ঞতারই ফল।^{১৫৬}

রাজনৈতিক সংগ্রামের শুরু

নাজিব আল-কিলানি ছাত্রজীবন থেকেই মিসরের অন্যতম প্রধান ইসলামী সংগঠন ‘আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন’-এর কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী হন।^{১৫৭} তিনি ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা শহীদ হাসান আল-বান্নার চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন এবং ইখওয়ানের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন।

একবার যুফতী নগরীতে ইখওয়ানের উদ্যোগে হিজরী নববর্ষ উপলক্ষে এক বিশাল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।^{১৫৮} নাজিব আল-কিলানি ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি ইখওয়ানের কর্মকাণ্ডের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। এ সময় তিনি

^{১৫৫} আবদুর রহমান শাকির, *আল হারাকাতুল আদাবিয়াহ আল ইসলামিয়াহ ফি মিসর* (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৩), পৃ. ৮৮।

^{১৫৬} আলী হাসান আত তামিমি, *তাভাওরুল ওয়ায়ী আল ইসলামী ফিল আদাব আল আরাবি* (দামেস্ক: আল ইত্তিহাদ, ২০১০), পৃ. ৪৩।

^{১৫৭} মুহাম্মাদ হানিফ আল আমীন, *তারীখ ও নিদাল আল ইখওয়ান আল মুসলিমুন* (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৮৯), পৃ. ১০১।

^{১৫৮} প্রাপ্ত।

ইখওয়ানের নিয়মিত পত্রিকা, বইপত্র এবং অন্যান্য প্রকাশনা অধ্যয়ন করতে থাকেন। পরবর্তীতে তিনি ইখওয়ানের সক্রিয় সদস্য হয়ে যান।

বন্দিজীবন ও নির্যাতন

১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের সরকার ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে কঠোর দমন-পীড়ন চালায়। ইখওয়ানের সদস্যদের গণহারে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। এই সময় দ্বিতীয়বারের মতো নাজিব আল-কিলানিকে গ্রেপ্তার করা হয়।^{১৫৯}

কারণারে বন্দি থাকাকালীন তিনি সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যান। এই সময় তিনি তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘আল-তারীক আল-তাউয়িল’ (দীর্ঘ পথ) লিখেন, যা ১৯৫৭ সালে মিসরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।^{১৬০}

প্রবাসজীবন

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি মিসর ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং প্রথমে কুয়েতে চলে যান। সেখানে কিছুদিন চাকরি করার পর তিনি দুবাই চলে যান। পরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন।^{১৬১}

এই সময় তিনি আরব বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্য পরিষদের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ইসলামি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি উপসাগরীয় অঞ্চলের স্বাস্থ্য ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলেন।

^{১৫৯} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

^{১৬০} প্রাগুক্ত।

^{১৬১} হামদি আব্দুল্লাহ, *হায়াত ও আদাব নাজিব আল কিলানি* (কায়রো: দারুল ফিকর, ১৯৯৮), পৃ. ২৫।

সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সংগ্রাম

নাজিব আল-কিলানির সাহিত্যকর্মে রাজনৈতিক সংগ্রামের স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তাঁর লেখা উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা ও জীবনীসাহিত্য ইসলামি চেতনা ও সামাজিক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। তিনি শুধু মিসর নয়, বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

শেষজীবন ও মৃত্যু

১৯৯৪ সালে তিনি মিসরে ফিরে আসেন এবং এক বছর পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য তাঁকে সৌদি আরবের রিয়াদে বাদশাহ ফয়সাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।^{১৬২} ১৯৯৫ সালের ৬ই মার্চ এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি চার সন্তান রেখে যান, যারা সবাই উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান ছিলেন।^{১৬৩}

ড. নাজিব আল-কিলানি ছিলেন একজন সংগ্রামী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। তাঁর সাহিত্যকর্ম ও রাজনৈতিক জীবন ইসলামি আদর্শ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর রচনা আজও মুসলিম বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

^{১৬২} আবু তালহা মুসা, *আল ফিকর আস সিয়াসি লিল আদাব আল আরাব আল মু'আছিরিন* (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী, ২০০৫), পৃ. ১৫৮।

^{১৬৩} হামদি আব্দুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহিত্য সাধনা

সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহ

শৈশবকাল থেকেই নাজিব আল-কিলানি সাহিত্যচর্চার প্রতি ঝোঁক অনুভব করতেন। গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের দুঃখ-কষ্ট, সংগ্রাম এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাস্তবতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। এই ভাবনার প্রতিফলন তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করেন।

প্রথমদিকে তিনি ছোটগল্প ও কবিতা লিখতে শুরু করেন, যেখানে ইসলামী মূল্যবোধ, সামাজিক বাস্তবতা ও নৈতিক শিক্ষা প্রতিফলিত হতো। তাঁর লেখায় ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং মানুষের কল্যাণকামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়। এই আগ্রহই তাঁকে পরবর্তী সময়ে একজন সফল সাহিত্যিক করে তোলে।

জীবনের প্রথম থেকে নাজীব আল-কিলানি ছিলেন একজন ভালো পাঠক। হাতের কাছে যা পেতেন তিনি পাঠ করতেন। বিশেষতঃ শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক বই পড়ার প্রতি তাঁর প্রবল ঝোঁক ছিলো।^{১৬৪} সে সময়ে আরব বিশ্ব থেকে প্রকাশিত সকল সাহিত্য সাময়িকী যেমন, আল-রিসালা, আল-ছাকাফা, আল-হিলাল, আল-মুতাতাফ ইত্যাদির তিনি নিয়মিত পাঠক ছিলেন।^{১৬৫} আর এর মাধ্যমে ঊনবিংশ শতকের আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখক যেমন সায্যিদ কুতুব, মুস্তফা সাদিক আল-

^{১৬৪} আলী মুহাম্মাদ সালাম, *আল-আদাব ওয়াল ইসলাম* (বৈরুত: দারুল বায়ান, ২০০৫), পৃ. ৫৬।

^{১৬৫} মুহাম্মাদ কুরায়শি, *আদাব আল-ইসলামী ওয়াদ-দাওয়াহ* (বৈরুত: দারুল উলুম, ১৯৯০), পৃ. ৫২।

রাফিঈ, আল-আক্কাদ, আল-মাযিনী, আল-মান্ফালুতী, তাহা হোসায়ন, তাওফীক আল-হাকীম প্রমুখের সাথে পরিচিত হন।^{১৬৬}

প্রথম দিকে তাঁর পছন্দ অপছন্দের কোন লেখক বা লেখার ধারা ছিলোনা। হাতের কাছে যা পেতেন তাই পড়ে ফেলতেন। এ সময় তিনি বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যের গল্প-কাহিনী, আরবী গল্প উপন্যাস, অনেক কবি যেমন, আল-মুতানাব্বী, আল-মা'আররী, শাওকী, হাফিজ ইব্রাহীম প্রমুখের কবিতা প্রচুর পড়েছেন।

তানতা অবস্থান কালে তিনি সেখানকার পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত পাঠক ছিলেন।^{১৬৭} যেহেতু আর্থিক স্বচ্ছলতা তাঁর তেমন ছিলোনা, তাই অনেক সময় কয়েকজন বন্ধু মিলে কোনো বিশেষ বই কিনতেন এবং পালাক্রমে পাঠ করতেন। তাঁর পাঠের প্রতি এই গভীর অনুরাগই ভবিষ্যতে তাঁকে সাহিত্য রচনার পথে পরিচালিত করে।

তাঁর সাহিত্য সাধনার সূচনা ঘটে ছাত্রাবস্থায়। প্রথমে তিনি ছোট গল্প লেখা শুরু করেন। তাঁর গল্পগুলোতে সমসাময়িক আরব বিশ্বের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ফুটে উঠতো। তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, দারিদ্র্য, অন্যায়, অবিচার এবং ইসলামি আদর্শকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাসে সমাজের নিপীড়িত মানুষের জীবনচিত্র এবং ইসলামের আদর্শিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে।^{১৬৮}

নাজিব আল-কিলানী ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। তাঁর রচনায় বাস্তবতার সাথে ইসলামী চেতনার সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তিনি কেবল বিনোদনধর্মী সাহিত্য রচনা করেননি, বরং তাঁর সাহিত্য মানুষের চিন্তাভাবনাকে ইসলামের দিকে প্রবাহিত করার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রচনায় ইসলামি জীবনবোধের গভীর প্রতিফলন দেখা যায়।

^{১৬৬} প্রাপ্ত।

^{১৬৭} মুহাম্মাদ আস-সালামি, *আল-আদাব আল-ইসলামি ওয়া-ত-তাহাদিয়াত* (রিয়াদ: দারুল মাআরিফ, ২০১২), পৃ. ১৩০।

^{১৬৮} প্রাপ্ত।

তিনি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাস্তববাদী ধারা অনুসরণ করেছেন। তাঁর লেখাগুলোর মধ্যে শক্তিশালী কাহিনীবিন্যাস, গভীর চরিত্রচিত্রণ এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও ইসলামী সমাধান ফুটিয়ে তোলার এক অনন্য দক্ষতা বিদ্যমান। তাঁর সাহিত্যকর্ম ইসলামী সমাজ গঠনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম

ড. নাজিব আল-কিলানী আধুনিক আরবি সাহিত্যে ইসলামী চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে উপন্যাস, ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনী এবং শিশুসাহিত্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা নিম্নরূপ:

উপন্যাসসমূহ

১. الطريق الطويل (আত-তারীক আত-তাওয়ীল) - 'দীর্ঘ পথ' (১৯৫৬)

এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস, যা তিনি কারাগারে থাকাকালীন রচনা করেন। ১৯৫৭ সালে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পুরস্কার লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।^{১৬৯}

২. اليوم الموعود (আল-ইয়াওম আল-মাউউদ) - 'অপেক্ষার দিন' (১৯৬০)

এই উপন্যাস মিশরের উচ্চশিক্ষা ও সাহিত্য পরিষদের পুরস্কার পায়।^{১৭০}

৩. في الظلام (ফি আয-জুলাম) - 'অন্ধকারে' (১৯৬১)

এটি সামাজিক অবক্ষয় এবং সত্যের অনুসন্ধান নিয়ে রচিত।

৪. قاتل حمزة (কাতিল হামযা) - 'হামযার হত্যাকারী'

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত।

^{১৬৯} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, প্রগুক্ত, পৃ. ৩২।

^{১৭০} প্রাগুক্ত।

৫. أهل الحميدية (আহলুল হামিদিয়াহ) - 'হামিদিয়ার জনগণ'
৬. مملكة البلعوطي (মামলাকাতুল বালাউতী) - 'বালাউতির রাজ্য'
৭. نور الله (নূরুল্লাহ) - 'আল্লাহর আলো'
৮. ليل وقضبان (লাইল ওয়া কাদবান) - 'রাত ও শিকল'
৯. رجال وذئاب (রিজাল ওয়া ডিজাব) - 'মানুষ ও নেকড়ে'
১০. حكاية جاد الله (হিকায়াতু জাদুল্লাহ) - 'জাদুল্লাহর গল্প'
১১. مواكب الأحرار (মাওয়াকিবুল আহরার) - 'স্বাধীনতার মিছিল'
১২. عمر يظهر بالقدس (উমর ইয়াযহারু ফিল কুদস)

'ওমরের জেরুজালেমে আবির্ভাব'

১৩. ليالي تركستان (লায়ালী তুর্কিস্তান) - 'তুর্কিস্তানের রজনীগুলো'

এটি ৩০ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।

১৪. عمالة الشمال (উমালিকাতুশ শিমাল) - 'উত্তরের দানব'

নাইজেরিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম নিয়ে রচিত।

১৫. أميرة الجبل (আমীরাতুল জাবাল) - 'পর্বতের রাজকন্যা'

১৬. عذراء جاكارتا (আযরা জাকার্তা) - 'জাকার্তার কুমারী'

ইন্দোনেশিয়ার সামাজিক সংকট ও ইসলামের পুনর্জাগরণ নিয়ে রচিত।

১৭. اعترافات عبد المتجلي (ইতিরাফাত আবদুল মুতাজল্লী) - 'আব্দুল মুতাজল্লীর স্বীকারোক্তি'

১৮. امرأة عبد المتجلي (ইমরাতু আবদুল মুতাজল্লী) - 'আব্দুল মুতাজল্লীর স্ত্রী'

১৯. الكابوس (আল-কাবুস) - 'দুঃস্বপ্ন'

২০. رحلة إلى الله (রিহলাত ইলাল্লাহ) - 'আল্লাহর পথে যাত্রা'

২১. الرايات السوداء (আর-রায়াতুস সুদা) - 'কালো পতাকা'

২২. ملكة العنب (মালিকাতুল ইনাব) - 'আঙ্গুরের রানী'

২৩. النداء الخالد (আন-নিদাউল খালিদ) - 'শাশ্বত আহ্বান'

ছোটগল্পসমূহ

১. عند الرحيل (ঈন্দা আর-রাহিল) - 'বিদায়ের সময়'

২. موعدنا غداً (মাওইদুনা গাদান) - 'আগামীকালের প্রতিশ্রুতি'

৩. العالم الضيق (আল-আলাম আদ-দাইয়িক) - 'সংকীর্ণ বিশ্ব'

৪. رجال الله (রিজালুল্লাহ) - 'আল্লাহর সৈনিক'

৫. فارس هوازن (ফারিস হাওয়াজিন) - 'হাওয়াজিনের বীরযোদ্ধা'

৬. حكايات طبيب (হিকায়াতু তাবিব) - 'একজন চিকিৎসকের গল্প'

৭. الكابوس (আল-কাবুস) - 'দুঃস্বপ্ন'

কবিতা

১. أغاني الغرباء (আগানি আল-গুরাবা) - 'অজ্ঞাতদের গান' (১৯৬৩)

২. عصر الشهداء (আসর আশ-শুহাদা) - 'শহীদদের যুগ'
৩. كيف ألقاك (কাইফা আলকাক) - 'আমি কিভাবে তোমাকে পাবো' (১৯৭৮)
৪. مهاجر (মুহাজির) - 'প্রবাসী' (১৯৮৬)
৫. مدينة الكبائر (মাদিনাতুল কাবায়ের) - 'পাপের শহর' (১৯৮৮)
৬. أغنيات الليل الطويل (আগানিয়াতুল লাইল আত-তাওয়ীল) - 'দীর্ঘ রাতের গান' (১৯৯০)

গবেষণা ও প্রবন্ধ

১. المجتمع المرضي (আল-মুজতামা আল-মারদা) - 'অসুস্থ সমাজ'
২. الإسلام والقوى المضادة (আল-ইসলাম ওয়াল-কুওয়া আল-মুদাদ্দাহ) - 'ইসলাম ও প্রতিপক্ষ শক্তি'
৩. الطريق إلى اتحاد إسلامي (আত-তারীক ইলা ইত্তিহাদ ইসলামী) - 'একটি ইসলামী ঐক্যের পথ'
৪. مدخل إلى الأدب الإسلامي (মুদাখখাল ইলা আল-আদাব আল-ইসলামী) - 'ইসলামী সাহিত্যের ভূমিকা'
৫. الإسلامية والمذاهب الأدبية (আল-ইসলামিয়াহ ওয়াল-মাযাহিব আল-আদাবিয়াহ) - 'ইসলামী সাহিত্য ও সাহিত্যিক প্রবণতা'
৬. آفاق الأدب الإسلامي (আফাক আল-আদাব আল-ইসলামী) - 'ইসলামী সাহিত্যের পরিধি'

৭. الأدب الإسلامي بين النظرية والتطبيق (আল-আদাব আল-ইসলামী বাইনা আন-নাযারিয়াহ ওয়া আত-তাতবিক) - 'ইসলামী সাহিত্য: তত্ত্ব ও প্রয়োগ'
৮. تجربتي الذاتية في القصة الإسلامية (তাজরিবাতি আয-জাতিয়্যাহ ফিল কিসসাহ আল-ইসলামিয়াহ) - 'ইসলামী গল্প রচনায় আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা'
৯. لمحات من حياتي (লামহাতু মিন হায়াতি) - 'আমার জীবনের ঝলক'
১০. إقبال الشاعر النائر (ইকবাল আশ-শায়ের আস-সায়ের) - 'বিদ্রোহী কবি ইকবাল'

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্যে ড. নাজিব আল কিলানীর অবদান

ড. নাজিব আল-কিলানী আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম পথপ্রদর্শক, যিনি উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও গবেষণার মাধ্যমে সাহিত্যকে একটি কার্যকর দাওয়াতি মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্যিক কর্ম শুধু সাহিত্যিক উৎকর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং এটি ইসলামী মূল্যবোধ, ঐতিহাসিক চেতনা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের এক বাস্তব প্রতিফলন।

তাঁর রচনায় ইসলামের আদর্শ, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চেতনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজকে সচেতন করেছেন।

ইসলামী শিক্ষার প্রসার, সমাজসংস্কারের প্রয়াস এবং সাহিত্যকে দাওয়াতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিলানীর অবদান অনন্য। তাঁর সাহিত্য শুধু বিনোদনের জন্য নয়; বরং এটি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয় গঠনে, ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে এবং জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এভাবে নাজিব আল-কিলানী আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আলোচ্য অধ্যায়ে তাঁর ইসলামী সাহিত্যে বহুমুখী অবদানের নানা দিককে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ ও চেতনাবোধ

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যচর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যার মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করা সম্ভব। তাঁর সাহিত্যকর্মে ইসলামী মূল্যবোধের বিভিন্ন দিক যেমন আকিদা, আদর্শ, নৈতিকতা, সামাজিক বিচার-বিবেচনা, দাওয়াত ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর রচনাসমূহ কেবল বিনোদনের জন্য রচিত হয়নি; বরং এগুলো ইসলামী চিন্তাধারার প্রচার ও প্রতিষ্ঠার একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

ইসলামী সাহিত্যচিন্তার ভিত্তি

নাজিব আল-কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মে ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক দিকগুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য কেবল কল্পনার খেলা নয়, বরং তা একটি জাতির পরিচয় বহন করে। তাঁর লেখনীতে ইসলামের মৌলিক আদর্শ—তাওহীদ, রিসালাত, আখেরাতের ধারণা সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।^{১৭১} তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হওয়া ইসলামী সাহিত্যচিন্তার ভিত্তিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিম্নরূপে চিত্রায়িত করা যেতে পারে।

ইসলামী সাহিত্যচিন্তা এক বিস্তৃত ও সুগঠিত ধারণা, যা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহিত্য রচনার নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে। এটি কেবল ধর্মীয় ভাবধারার প্রচার নয়; বরং মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাহিত্যকে ব্যবহার করার একটি মাধ্যম। ইসলামী

^{১৭১} আব্দুল্লাহ ইবনে সালিহ আল উরায়নী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

সাহিত্যচিন্তার ভিত্তি ও লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এটি একাধারে জ্ঞান, মূল্যবোধ, ইতিহাস ও দাওয়াহর সমন্বয়ে গঠিত।

ইসলামী সাহিত্য এমন এক সাহিত্য, যা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়। এটি কেবল ধর্মীয় গ্রন্থ নয়; বরং সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ উপস্থাপনার মাধ্যমে মানবজাতিকে সত্যের পথে আহ্বান জানায়। ইসলামী সাহিত্যচিন্তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি নিম্নরূপ:

১. **তাওহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি:** ইসলামী সাহিত্য সর্বদা আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।
২. **আখিরাতের ধারণা:** এ সাহিত্য মানুষের পার্থিব জীবনকে চূড়ান্ত গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করে না; বরং আখিরাতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে।
৩. **সত্যানুসন্ধান ও ন্যায়পরায়ণতা:** ইসলামী সাহিত্য সত্য ও ন্যায়ের বার্তা প্রদান করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়।
৪. **নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন:** মানব চরিত্র গঠনের জন্য এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
৫. **দাওয়াহ ও সংস্কারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি:** ইসলামী সাহিত্য শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, বরং মানুষের আত্মিক উন্নয়নের জন্য রচিত হয়।

নাজিব আল-কিলানী ছিলেন আধুনিক ইসলামী সাহিত্যচিন্তার পথিকৃৎদের অন্যতম। তাঁর সাহিত্য ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং মুসলিম উম্মাহর জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে ইসলামী সাহিত্যচিন্তার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়:^{১৭২}

^{১৭২} আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, *মুসাহামাতু ড. নাজীব আল কিলানী ফিল আদাবিল আরাবিয়্যিল হাদীস*, পিএইচডি অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অক্টোবর, ২০০১, পৃ. ১২৫।

১. সত্য ও মিথ্যার সংঘাত: তাঁর উপন্যাস ও গল্পে নৈতিক দ্বন্দ্ব, সত্য-মিথ্যার লড়াই, এবং মানবতার পরিপূর্ণতা পাওয়া যায়।
২. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সামাজিক সমস্যা উপস্থাপন: সমাজে প্রচলিত অন্যায়, দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরতে তিনি ইসলামী মূল্যবোধকে ভিত্তি করেছেন।
৩. ইসলামী আন্দোলন ও রাজনীতি: তাঁর লেখায় ইসলামী আন্দোলনের গুরুত্ব ফুটে ওঠে, যা সমসাময়িক বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করে।
৪. মানবতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি আহ্বান: তিনি মানবতাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরেছেন।

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী সাহিত্যচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমা সাহিত্য ও মিডিয়ার আধিপত্যে যেখানে নৈতিক অবক্ষয় এবং ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারিত হচ্ছে, সেখানে ইসলামী সাহিত্য মানবজাতির জন্য প্রকৃত মুক্তির বার্তা প্রদান করে।

ইসলামী সাহিত্যচিন্তা কেবল ধর্মীয় সাহিত্য নয়, বরং এটি এক বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি যা মানব সভ্যতার উন্নতি ও মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করে। নাজিব আল-কিলানীসহ অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটি আরও সুসংগঠিত হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে এটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।^{১৭৩} ইসলামী সাহিত্যচিন্তার ভিত্তির উপর ভিত্তি করে সাহিত্য রচনার ধারা অব্যাহত থাকলে তা মুসলিম উম্মাহর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

সাহিত্যকর্মে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতিফলন

ড. নাজিব আল কিলানী আধুনিক আরবি সাহিত্য জগতে ইসলামী মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যকে সাহিত্যিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর সাহিত্যকর্মে ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের যে প্রতিফলন দেখা যায়, তা নিছক সাহিত্যিক রচনার গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, বরং এটি একটি দাওয়াহমূলক প্রচেষ্টা, যার মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন।

^{১৭৩} প্রাপ্ত।

ড. নাজিব আল কিলানীর উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী রচনায় ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের নানা দিক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

১. ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রতিফলন

তাঁর সাহিত্যকর্মে রাসূল (সা.)-এর জীবন, সাহাবিদের আত্মত্যাগ এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশেষত, তাঁর "আর-রিহলা" (ভ্রমণ) এবং "ফাতহুল কুদস" (জেরুজালেম বিজয়) উপন্যাসগুলোতে তিনি ইসলামের প্রথম দিকের ইতিহাসকে বাস্তবসম্মত কাহিনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।^{১৭৪}

২. মুসলিম শাসনামলের গৌরব

তিনি আব্বাসীয়, উমাইয়া এবং উসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসনকালকে গুরুত্ব সহকারে তাঁর সাহিত্যে উপস্থাপন করেছেন। মুসলিম বিশ্বে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, চিকিৎসা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় উন্নতি সাধিত হয়, সেই সময়কার চিত্র তাঁর রচনায় বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

৩. ইসলামী জিহাদ ও প্রতিরোধ সংগ্রাম

ড. কিলানী তাঁর অনেক উপন্যাসে মুসলমানদের বিভিন্ন জিহাদী সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে, ক্রুসেডের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিরোধ, আন্দালুসের মুসলিম ইতিহাস, এবং ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামী প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

ইসলামের সংস্কৃতি ও জীবনধারা

ইসলামের সংস্কৃতি বলতে বোঝানো হয় মুসলমানদের জীবনধারা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনা, নৈতিকতা এবং রীতি-নীতি। ড. কিলানীর রচনায় এসব উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

^{১৭৪} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১।

১. মুসলিম পারিবারিক কাঠামো ও মূল্যবোধ

তিনি তাঁর রচনায় মুসলিম পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। পিতামাতা ও সন্তানের সম্পর্ক, স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক শিষ্টাচার এবং নৈতিকতার শিক্ষা তাঁর রচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. ইসলামের নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা

ড. কিলানী তাঁর রচনায় বারবার ইসলামের নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কেবল বাহ্যিক উপাসনা যথেষ্ট নয়, বরং ইসলাম মানুষের আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে সমাজকে পরিবর্তন করতে চায়।

৩. শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্ব

তাঁর রচনায় ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষা ও গবেষণার প্রসার ঘটেছিল এবং কিভাবে মুসলিম মনীষীরা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী দাওয়াত ও নৈতিক আদর্শের প্রসার

ইসলামী সাহিত্য: দাওয়াতের মাধ্যম

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। সাহিত্য মানুষের চিন্তা-চেতনাকে গঠন ও প্রভাবিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ইসলামের দাওয়াত কার্যক্রমে সাহিত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করছে। ইতিহাস সাক্ষী যে, মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ সাহিত্যকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করা, তাদের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করা এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বান করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী সাহিত্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত।

সাহিত্য মানবজাতির চিন্তাকে গঠন ও পরিচালনা করার শক্তিশালী মাধ্যম। ইতিহাসে দেখা গেছে, মহান ব্যক্তির তঁদের দাওয়াতি কার্যক্রমে সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন। ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে সাহিত্যের মাধ্যমে দাওয়াতকে তুলে ধরে।

- **আল-কুরআন ও হাদিস:** আল-কুরআন ইসলামী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াতি গ্রন্থ। কুরআনের ভাষা অলঙ্কারমণ্ডিত ও হৃদয়গ্রাহী, যা মানুষকে আকর্ষণ করে। নবী মুহাম্মদ (স.)-এর হাদিসগুলোও সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়।
- **সাহাবাদের কবিতা ও ভাষণ:** সাহাবীরা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে কবিতা ও ভাষণের আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে, হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) ইসলামের পক্ষে কবিতা রচনা করতেন এবং মুশরিকদের অপপ্রচারের জবাব দিতেন।

- **ইসলামের ইতিহাস ও সিরাতগ্রন্থ:** ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সিরাতগ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব গ্রন্থ মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেয় এবং সত্যের পথে আহ্বান জানায়।

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যে দাওয়াত

ড. নাজীব আল-কিলানী সাহিত্যকে ইসলামের দাওয়াতের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং ইসলামী মূল্যবোধকে সাহিত্যের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তিনি মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলো তুলে ধরেছেন এবং সমাধানের পথ দেখিয়েছেন।^{১৭৫}

১. উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে দাওয়াত

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে ইসলামী মূল্যবোধ, নৈতিকতা, সামাজিক বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক শিক্ষা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

২. সমকালীন মুসলিম বিশ্বের সমস্যা

তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে তাঁর উপন্যাস ও লেখায় স্থান দিয়েছেন। তাঁর একাধিক উপন্যাসে তিনি উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ইসলামী পুনর্জাগরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন।^{১৭৬}

৩. তাঁর কবিতা ও ইসলামী মূল্যবোধ

তিনি কবিতার মাধ্যমেও ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করেছেন। তাঁর কবিতাগুলোতে আত্মবিশ্বাস, ঈমান, সংগ্রাম ও সত্যের পথে অবিচল থাকার আহ্বান ফুটে উঠেছে।

^{১৭৫} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭।

^{১৭৬} প্রাগুক্ত।

৪. সাংস্কৃতিক ও দাওয়াতি সংগঠনে তাঁর ভূমিকা

তিনি “আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংঘ”-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ইসলামী সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

৫. ইসলামী চিকিৎসা সাহিত্য

চিকিৎসা শাস্ত্রেও তিনি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সংযোজন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ “নবী (স.)-এর চিকিৎসা পদ্ধতি” এবং “রোযা ও স্বাস্থ্য” ইসলামী দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়।^{১৭৭}

ইসলাম প্রচারে সাহিত্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং করছে। ড. নাজীব আল-কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে ইসলামের সুমহান আদর্শ ও মূল্যবোধকে উপস্থাপন করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর সমস্যাগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধান দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়, বরং এটি মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করার শক্তিশালী হাতিয়ার। ইসলামের দাওয়াতকে সুসংহত করতে হলে ইসলামী সাহিত্যচর্চাকে আরও বিস্তৃত ও শক্তিশালী করতে হবে।

সাহিত্যের মাধ্যমে নৈতিক উন্নয়নে অবদান

সাহিত্য মানবজীবনের আয়না স্বরূপ। এটি মানুষের চিন্তা, চেতনা ও নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ড. নাজীব আল-কিলানী তার সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং সমাজ সংস্কারের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। তার রচিত উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্যান্য সাহিত্যকর্ম ইসলামী মূল্যবোধকে ভিত্তি করে মানুষের নৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

^{১৭৭} আ জ ম কুতুবুল ইসলাম নোমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২।

ইসলামী আদর্শ ও নৈতিকতা

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্য ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে গঠিত। তার রচনাগুলোতে সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা, ধৈর্য, সহমর্মিতা ও আত্মত্যাগের মতো গুণাবলী ফুটে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, নৈতিকতার উন্নয়ন ছাড়া সমাজ কখনোই স্থিতিশীল হতে পারে না। তার উপন্যাসগুলোতে চরিত্রগুলোকে এই গুণাবলী ধারণ করতে দেখা যায়, যা পাঠকদের অনুপ্রাণিত করে।

১. উপন্যাস ও গল্পে নৈতিক শিক্ষা

ড. নাজিব আল-কিলানীর উপন্যাসে নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত চমৎকারভাবে। তার রচিত ‘হিকায়াতু তাবীব’ (একজন চিকিৎসকের গল্প) উপন্যাসে একজন চিকিৎসকের সংগ্রাম, সততা, মানবসেবার প্রতি তার নিষ্ঠা এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্ববোধের কথা তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাস তরুণ চিকিৎসকদের নৈতিকতা ও মানবসেবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।^{১৭৮}

তার আরেকটি বিখ্যাত উপন্যাস ‘রিহলাতু ইলা আল্লাহ’ (আল্লাহর পথে যাত্রা) মানুষের আত্মশুদ্ধি, ত্যাগ ও আল্লাহর পথে নিজেকে উৎসর্গ করার শিক্ষার আদর্শ উদাহরণ।^{১৭৯} এ ধরনের রচনাগুলো পাঠকদের অন্তরে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তাদের নৈতিকভাবে উন্নত হতে সাহায্য করে।

২. কবিতার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির বার্তা

ড. নাজিব আল-কিলানীর কবিতায় ইসলামী চেতনা, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার অনুপ্রেরণা বিদ্যমান। তার কবিতাগুলোতে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং উত্তরণের পথ নির্দেশনা পাওয়া যায়।

^{১৭৮} মুহাম্মদ সোলায়মান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮।

^{১৭৯} প্রাগুক্ত।

৩. প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক রচনায় নৈতিক চেতনার বিস্তার

ড. নাজিব আল-কিলানী শুধুমাত্র উপন্যাস ও কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, তিনি ইসলামী সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার ‘ইসলামী সাহিত্যের নীতিমালা’ গ্রন্থে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে সাহিত্য মানুষের নৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি বলেন, “একজন লেখকের দায়িত্ব হলো, তার লেখার মাধ্যমে সমাজের সত্য ও ন্যায়ের বার্তা পৌঁছে দেয়া এবং মানুষকে উন্নত নৈতিকতার পথে পরিচালিত করা।”^{১৮০}

নৈতিকতা উন্নয়নে সাহিত্যের ভূমিকা

১. তরুণ প্রজন্মের নৈতিক বিকাশ

ড. নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য তরুণদের নৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার সাহিত্যকর্ম তরুণদের সত্যের পথে চলতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নিজেদের উত্তম মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

২. সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি

তার রচনাগুলোতে সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বার্তা রয়েছে। তিনি মনে করতেন, সমাজ পরিবর্তনের জন্য নৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য। তিনি তার রচনাগুলোর মাধ্যমে মানুষকে শোষণ, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সচেতন করেছেন।

^{১৮০} প্রাপ্ত।

৩. ইসলামী সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার

তিনি তার সাহিত্যকর্মে ইসলামী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে ইসলামের আদর্শ একজন মানুষকে নৈতিকভাবে উন্নত করতে পারে এবং সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

ড. নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি। তার সাহিত্যকর্ম মানুষকে সত্যের পথে চলতে, আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে এবং সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আজকের যুগেও তার সাহিত্য প্রাসঙ্গিক এবং তা মানবজাতির নৈতিক উন্নয়নের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার সাহিত্যকর্ম ভবিষ্যতেও পাঠকদের অনুপ্রেরণা ও দিকনির্দেশনা দিয়ে যাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যে কুরআনের শিক্ষার প্রসার

সাহিত্য মানুষের চিন্তা, নীতি ও আদর্শ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, যখন কোনো সাহিত্য ইসলামের মৌলিক শিক্ষার আলোকে রচিত হয়, তখন তা একটি জাতির নৈতিক উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। ড. নাজীব আল-কিলানী ছিলেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক, যিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে কুরআনের শিক্ষা প্রতিফলিত করেছেন। তাঁর উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধগুলোতে কুরআনের আয়াত ও তা থেকে উদ্ভূত নীতিগুলো সুস্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

১. নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য ও কুরআনের প্রভাব

ড. আল-কিলানী বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধ মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তাই তাঁর লেখাগুলো কেবল কল্পনার উপস্থাপনা নয়, বরং কুরআনের নৈতিকতা ও জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

(ক) কুরআনের আয়াতের প্রত্যক্ষ উদ্ধৃতি

তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কুরআনের আয়াতের সরাসরি উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। বিশেষত: নৈতিকতা, ইনসাফ (ন্যায়বিচার), তাওহীদ (একত্ববাদ), ধৈর্য, আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা সম্পর্কে আয়াতগুলো তিনি তাঁর গল্প ও উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর একটি উপন্যাসে তিনি উল্লেখ করেছেন:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে”^{১৮১}

এই আয়াতটি গল্পের প্রধান চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের সময় ব্যবহৃত হয়েছে, যা পাঠকদের মাঝে ধৈর্যের গুরুত্ব বোঝাতে সহায়তা করে।

(খ) কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী চরিত্র গঠন

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে চরিত্রগুলো কুরআনের শিক্ষার আলোকে গঠিত। তাদের ব্যক্তিত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ সবই ইসলামের মৌলিক নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা।

উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর “রিহলাতু ইলা আল্লাহ” উপন্যাসে প্রধান চরিত্রটি জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে কুরআনের আয়াতের ওপর নির্ভর করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(গ) সামাজিক সমস্যা সমাধানে কুরআনের শিক্ষা

তাঁর সাহিত্যকর্মে কুরআনের আলোকে সামাজিক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমন:

- দুর্নীতি দমন
- নারী ও পুরুষের সম্মান
- ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার
- শিক্ষা ও নৈতিকতা

তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি সমাজ কুরআনের শিক্ষা অনুসরণ করে, তাহলে এই সকল সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

^{১৮১} আল কুরআন, সূরা ইনশিরাহ – ৬।

২. নৈতিক শিক্ষা ও আত্মশুদ্ধি

(ক) সত্যবাদিতা ও ন্যায়বিচার

নাজীব আল-কিলানী তাঁর সাহিত্যে বারবার কুরআনের সত্যবাদিতার শিক্ষা তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সত্য বলা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণ স্বরূপ, কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য দিও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়”^{১৮২}

এই আয়াতের ভিত্তিতে, তিনি দেখিয়েছেন যে একজন মুসলিম কিভাবে নিজের স্বার্থের বিপরীত হলেও সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়।

(খ) ধৈর্য ও সংগ্রাম

আল-কিলানীর উপন্যাসে প্রায়ই দেখা যায় যে তাঁর চরিত্ররা কঠিন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করে এবং সংগ্রাম করে। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা সবসময় আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল থাকে।

কুরআনে বলা হয়েছে:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের সাথে আল্লাহ রয়েছেন”^{১৮৩}

^{১৮২} আল কুরআন, সূরা নিসা - ১৩৫।

এই আয়াতের প্রতিফলন তাঁর সাহিত্যকর্মে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(গ) আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া

আল-কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মে আত্মশুদ্ধির বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“যে নিজেকে শুদ্ধ করল, সে সফলকাম হল”^{১৮৪}

তাঁর চরিত্রগুলো নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে এবং পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের চেষ্টা করে, যা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা।

৩. ইসলামী সমাজ গঠনে কুরআনের ভূমিকা

(ক) ইসলামি পরিবার ও নারী অধিকার

তাঁর সাহিত্যকর্মে তিনি পরিবার ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একটি পরিবার গঠন করা সম্ভব।

কুরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর”^{১৮৫}

এই আয়াতের আলোকে তিনি পরিবারের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

^{১৮৩} আল কুরআন, সূরা বাক্বারা - ১৫৩।

^{১৮৪} আল কুরআন, সূরা শামস - ৯।

^{১৮৫} আল কুরআন, সূরা তাহরিম - ৬।

(খ) ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও ইনসাফ

তাঁর লেখায় বারবার ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও ন্যায়বিচারের গুরুত্ব উঠে এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি একটি জাতি কুরআনের বিধান অনুসারে চলে, তবে সেখানে অন্যায় ও অবিচার থাকবে না।

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্ম কুরআনের শিক্ষা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। তিনি তাঁর গল্প, উপন্যাস ও গবেষণায় কুরআনের আলোকে নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ, ধৈর্য, সত্যবাদিতা, ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য শুধু বিনোদন নয়, বরং এটি ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর এই অবদান ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গবেষণামূলক সাহিত্যকর্ম

নাজীব আল-কিলানীর ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণামূলক কাজ ছিল সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী। তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মীয় শিক্ষা ও সমকালীন সমাজবিজ্ঞানকে একত্রিত করে ইসলামী শিক্ষার এক আধুনিক ও কার্যকর রূপরেখা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর গবেষণাগুলো ইসলামী সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষাব্যবস্থায় দিকনির্দেশনামূলক ভূমিকা রেখেছে।

১. ইসলামী শিক্ষার মূলনীতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

নাজীব আল-কিলানী বিশ্বাস করতেন যে ইসলামী শিক্ষা কেবল ধর্মীয় অনুশীলন বা আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাঁর গবেষণায় তিনি কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী শিক্ষার মৌলিক নীতিগুলো ব্যাখ্যা করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে—

- **তাওহীদবাদী দৃষ্টিভঙ্গি:** আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা ও একত্ববাদকে ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করা।

- **নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধি:** জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত উদ্দেশ্য আত্মার পরিশুদ্ধি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন।
- **দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয়:** কেবল পার্থিব সাফল্য নয়, বরং আখিরাতের কল্যাণকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত।
- **সর্বজনীনতা ও বাস্তবধর্মিতা:** ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানবকল্যাণ, যা জাতি, ভাষা বা অঞ্চলভেদে সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

২. ইসলামী শিক্ষা ও সাহিত্য: সংযোগ ও গবেষণা

নাজীব আল-কিলানী ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য সাহিত্যের শক্তিকে ব্যবহার করেছেন। তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সাহিত্য কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়; এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াহর অঙ্গ। তাঁর সাহিত্যকর্মে তিনি শিক্ষার গুরুত্ব ও মৌলিক নীতিসমূহ গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ—

- **‘ইসলামী সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্য মতবাদ’** গ্রন্থে তিনি ইসলামী সাহিত্যকে প্রচলিত পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তার তুলনায় এক ভিন্নতর চিন্তাধারা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রধানত বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তার ওপর গড়ে উঠেছে, যা মানুষের প্রকৃত মুক্তির পথ প্রদর্শনে ব্যর্থ।
- **‘দীন ও রাষ্ট্র’** বইয়ে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ করার প্রস্তাব দেন। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেন কিভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রে শিক্ষা হবে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত।

৩. ইসলামী শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও তাঁর সমাধানমূলক গবেষণা

নাজীব আল-কিলানী তাঁর গবেষণাগুলোতে মুসলিম সমাজের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

- **ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও এর প্রভাব:** পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ মুসলিম তরুণদের মধ্যে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটালেও নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়েছে।
- **ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক বিজ্ঞান:** তিনি প্রস্তাব করেন যে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যা নৈতিকতা ও উন্নয়নের মধ্যে ভারসাম্য আনবে।
- **মিডিয়ার ভূমিকা:** তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রচারমাধ্যম ও সাহিত্য ইসলামী শিক্ষার প্রচারে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন যেখানে তিনি ইসলামী চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য মিডিয়া কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৪. ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর রচিত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ

নাজীব আল-কিলানী ইসলামী শিক্ষার গবেষণায় অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি—

- **‘ইসলামের পতাকা তলে’:** এই বইয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন ইসলামী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও এর যথাযথ বাস্তবায়ন কিভাবে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারে।
- **‘ইসলামি সাহিত্য ও তার দৃষ্টিভঙ্গি’:** এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে সাহিত্যিকভাবে উপস্থাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে ইসলামী সাহিত্য তরুণ প্রজন্মের চিন্তাভাবনা পরিবর্তন করতে পারে।
- **‘নবী (স.) এর চিকিৎসা পদ্ধতির অঙ্গনে’:** চিকিৎসা শাস্ত্রেও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং নবী (স.) এর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৫. মুসলিম বিশ্বে তাঁর গবেষণার প্রভাব

নাজীব আল-কিলানীর গবেষণা মুসলিম বিশ্বের অনেক শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর লেখাগুলো মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের পথ দেখিয়েছে। তাঁর গবেষণা বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছে—

- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে, যেখানে তাঁর বইগুলো গবেষণার অংশ হিসেবে পড়ানো হয়।
- ইসলামী আন্দোলনগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমে, যারা তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে তাদের দাওয়াহ কার্যক্রমে প্রয়োগ করে।
- তরুণ লেখকদের মধ্যে, যারা ইসলামী সাহিত্যের গুরুত্ব বুঝতে পেরে গবেষণা ও সাহিত্যচর্চার দিকে ঝুঁকছেন।

নাজীব আল-কিলানী ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে শিক্ষাকে কেবলমাত্র তথ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, বরং এটি আত্মার পরিশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক মানবতার কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা উচিত। তাঁর গবেষণা আজও মুসলিম শিক্ষাবিদদের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক অবক্ষয় রোধে ড. নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যকর্ম

সাহিত্যকর্মে সামাজিক অবক্ষয়ের সমালোচনা

ড. নাজিব আল কিলানী একজন বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্যিক, যিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতি ও অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছেন। তিনি ইসলামের আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং একইসঙ্গে সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের বিষয়গুলোকে বাস্তবসম্মতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর রচনাগুলোর মধ্যে সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিফলন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি বিভিন্ন উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধে দুর্নীতি, নৈতিক অবক্ষয়, ধর্মহীনতা, সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, অর্থলোভ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, এবং শিক্ষার অধঃপতনকে গভীরভাবে সমালোচনা করেছেন।

১. দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

ড. কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মে দুর্নীতিকে এক প্রধান সামাজিক ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত, তাঁর উপন্যাসগুলোতে দেখা যায় কিভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমাজকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করে। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে অসৎ রাজনীতিবিদ, লোভী ব্যবসায়ী ও অনৈতিক প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। তাঁর সাহিত্যকর্মে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামের গুরুত্ব বারবার উঠে এসেছে।

২. ধর্মহীনতার ফলাফল

ড. কিলানী বিশ্বাস করতেন যে ধর্মহীনতা সমাজের মূল ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। তিনি দেখিয়েছেন যে, ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি সমাজে অপরাধ, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং অবৈধ কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করে। একাধিক লেখায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে ধর্মের অনুপস্থিতি ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এছাড়াও, তার বিভিন্ন উপন্যাস সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরে, যেখানে মানুষ ধর্মীয় নীতিগুলোকে অগ্রাহ্য করে এক নৈরাজ্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ধর্মহীনতা মানুষের চরিত্রকে বিকৃত করতে পারে এবং কীভাবে এটি সমাজে অপরাধ বৃদ্ধির জন্য দায়ী।

৩. শিক্ষার অধঃপতন ও সমাজের অবক্ষয়

ড. কিলানী বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষাই হলো সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু যখন শিক্ষাব্যবস্থা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তখন পুরো সমাজ একটি অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত হয়। তাঁর সাহিত্যে শিক্ষাব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি উঠে এসেছে।

তাঁর উপন্যাস “হিকায়াতুত তাবীব” শিক্ষার মানহীনতা এবং সমাজে এর প্রভাব সম্পর্কে একটি চমৎকার চিত্র তুলে ধরে। এখানে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে ডাক্তারদের পেশাদারিত্বহীনতা এবং বাণিজ্যিকীকরণ স্বাস্থ্যসেবাকে ধ্বংস করেছে। এই উপন্যাসে কিলানী শিক্ষাকে শুধুমাত্র চাকরির নিশ্চয়তা লাভের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেছেন।

৪. নারীর অবমাননা ও পারিবারিক অবক্ষয়

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। কিন্তু সমাজে নারীদের প্রতি যে অবিচার ও শোষণ হয়, তা কিলানী তাঁর সাহিত্যে দৃশ্যমান করেছেন। তাঁর রচনায় নারীর প্রতি সমাজের অন্যায় আচরণ এবং তার প্রতিকার নিয়ে লেখা হয়েছে।

তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে পরিবার ভেঙে পড়লে পুরো সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়। নারী যখন শুধুমাত্র ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন সমাজে অবৈধ সম্পর্ক, পরকীয়া ও পারিবারিক কলহ বেড়ে যায়। তাঁর সাহিত্যে পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব এবং নারীর মর্যাদার বিষয়ে বারবার আলোচনা এসেছে।

৫. সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিলানীর অবস্থান

কুসংস্কার সমাজের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। ড. কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মে দেখিয়েছেন, কীভাবে অন্ধবিশ্বাস মানুষকে প্রভাবিত করে এবং সমাজের উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। তাঁর

উপন্যাসগুলো কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বার্তা বহন করে। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, কীভাবে সমাজের কিছু প্রভাবশালী গোষ্ঠী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং তাদের অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ রাখে।

৬. রাজনৈতিক নিপীড়ন ও সমাজের অধঃপতন

ড. কিলানী রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং এর ফলে সমাজে যে অস্থিরতা তৈরি হয়, তা নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে একনায়কতন্ত্র, দমন-পীড়ন এবং অনৈতিক শাসনব্যবস্থা একটি জাতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৭. নৈতিক উন্নয়নের আহ্বান

ড. কিলানী কেবল সামাজিক অবক্ষয়ের সমালোচনা করেই থেমে যাননি, বরং এর প্রতিকারও তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন। তিনি ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি উন্নত সমাজ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধগুলোতে নৈতিকতা, মানবিকতা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, সত্যবাদিতা ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ড. নাজিব আল কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে দুর্নীতি, ধর্মহীনতা, কুসংস্কার, শিক্ষার অধঃপতন, নারীর প্রতি অবিচার, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং পারিবারিক সংকট সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাঁর সাহিত্য শুধু সমালোচনা করার জন্য নয়, বরং সমাজকে পরিবর্তন করার জন্য রচিত হয়েছে। তাঁর রচনাগুলো আজও সমসাময়িক এবং শিক্ষণীয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, সাহিত্য মানুষের নৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এবং সমাজের কল্যাণে সাহিত্যের ভূমিকা অপরিসীম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাহিত্যে সংগ্রামী চেতনার প্রসার

সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চেতনা

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চেতনা গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে মুসলিমদের বিভিন্ন সংগ্রাম ও প্রতিরোধের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। নিচে তাঁর সাহিত্যে এই চেতনার বিশদ বিশ্লেষণ করা হলো।

১. ব্যক্তিগত ও মানসিক সংগ্রাম

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যকর্মে ব্যক্তিগত ও মানসিক সংগ্রামের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একজন ব্যক্তি কীভাবে সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ় থাকে, কীভাবে সে শয়তানি প্রলোভন ও নৈতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে—এসব তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে।

(ক) আত্ম-সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি

নাজীব আল-কিলানীর অনেক চরিত্র অন্তরদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন, তাঁর উপন্যাসগুলোতে নৈতিক মূল্যবোধ ও পার্থিব লোভের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এসব চরিত্র প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করে সত্যের পথে টিকে থাকার চেষ্টা করে।

(খ) চরিত্রের আত্মদর্শন ও সংগ্রামী মনোভাব

তাঁর উপন্যাসের নায়করা সাধারণত এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী, যারা প্রথমে দুর্বলতা ও সংশয়ের শিকার হয়, কিন্তু পরে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ওঠে। এই

মানসিক সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, ইসলামী জীবনযাত্রা কঠিন হলেও তা সত্য ও মুক্তির পথ।

২. সামাজিক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্য সমাজের অন্যায়, বৈষম্য, ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেতনাকে তুলে ধরে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মুসলিম সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, দারিদ্র্য, ও রাজনৈতিক নিপীড়ন ছড়িয়ে পড়েছে এবং কীভাবে মানুষ এসবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

(ক) সমাজের অবক্ষয় ও ইসলামের ভূমিকা

তাঁর লেখায় জাহিলিয়াতের যুগের সমাজ ও আধুনিক সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের তুলনা পাওয়া যায়। যেমন, তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে লোভ, দুর্নীতি, এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা সমাজের অবক্ষয়ের মূল কারণ।

(খ) নারীর মর্যাদা ও সংগ্রাম

নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রামের বিষয়টি নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যে বারবার এসেছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ইসলামী আদর্শ নারীদের সম্মান ও মর্যাদা দেয়, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজের বিপরীত। তাঁর অনেক উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলো নিজেদের অধিকার ও আত্মসম্মান রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে।

৩. রাজনৈতিক প্রতিরোধ ও ইসলামী আন্দোলন

নাজীব আল-কিলানী ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য, এবং তাঁর লেখায় ইসলামী আন্দোলনের সংগ্রাম স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে মুসলিম উম্মাহ পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে।

(ক) ইসলামী আন্দোলনের চেতনা

তিনি তাঁর উপন্যাসে মুসলিম উম্মাহর জাগরণ ও আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ ইসলামী আদর্শের প্রতি অনুগত হয়ে সমাজ পরিবর্তনের জন্য কাজ করতে পারে।

(খ) বন্দি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ড. নাজীব আল-কিলানী নিজেই রাজনৈতিক বন্দি ছিলেন এবং কারাগারের জীবন-সংগ্রাম তিনি তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনাগুলোতে কারাগারের জীবনের নির্মম বাস্তবতা এবং অত্যাচারিত মুসলিমদের ধৈর্য ও দৃঢ়তার কথা উঠে এসেছে।

৪. ইসলামের ইতিহাস ও সংগ্রামী চেতনা

তাঁর সাহিত্যে ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে ইসলামের ইতিহাসে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের চেতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(ক) ইসলামের প্রথম যুগের সংগ্রাম

তিনি রাসূল (সা.)-এর যুগের কষ্টকর মুহূর্তগুলো, যেমন মক্কার নির্যাতন, বদর ও উহুদের যুদ্ধ, ও মুসলমানদের আত্মত্যাগের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি মুসলমানদের মনে এই চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছেন যে, তারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের জীবনে সংগ্রাম ও প্রতিরোধের মনোভাব গড়ে তুলতে পারে।

(খ) উসমানী খেলাফতের পতন ও মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থা

তাঁর কিছু রচনায় উসমানী সাম্রাজ্যের পতন এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বে উপনিবেশবাদীদের আগ্রাসনের বিষয়টি উঠে এসেছে। তিনি মুসলিমদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৫. প্রতিরোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত চরিত্র ও উপন্যাস

নাজীব আল-কিলানীর রচনাগুলোতে সংগ্রামী চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

(ক) “আর-রিহলা” (The Journey)

এই উপন্যাসে একজন মুসলিম চিকিৎসকের সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে, যিনি ইসলাম ও মানবতার সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন এবং সমাজের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

(খ) “হিকায়াতু তাবিব” (একজন চিকিৎসকের গল্প)

এখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে একজন মুসলিম চিকিৎসক রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়েও সৎ পথে টিকে থাকেন।

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্য সংগ্রাম ও প্রতিরোধের চেতনাকে ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যা করেছে। তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মুসলিমদের সংকট ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন এবং সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য আজও মুসলিমদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে আছে, যা তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ও ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেতনা জাগিয়ে তোলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে ইসলামী আদর্শের প্রসার

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করেছেন এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে মুসলিম উম্মাহর চেতনা পুনর্জাগরণ, পাশ্চাত্যের আধিপত্যবাদী চিন্তাধারা থেকে মুক্তির আহ্বান এবং ইসলামের স্বতন্ত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

১. পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল দিকসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে এটি মূলত বস্তুবাদী ও উপনিবেশবাদী চিন্তাধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি পাশ্চাত্যের নিম্নলিখিত প্রভাবগুলোর সমালোচনা করেছেন:

ক) বস্তুবাদ ও নৈতিক অবক্ষয়

পাশ্চাত্য সভ্যতা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক দিকগুলোর প্রতি উদাসীন হয়ে কেবলমাত্র বস্তুগত উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছে। ফলে, পাশ্চাত্য সমাজে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা ক্রমশ অবক্ষয়ের শিকার হচ্ছে।

খ) উপনিবেশবাদ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

তিনি পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর প্রসার ও তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের সমালোচনা করেছেন। মুসলিম বিশ্বে পাশ্চাত্যের ভাষা, শিক্ষা, ও জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামী সংস্কৃতি ও চেতনাকে দুর্বল করেছে।

গ) ইসলামের বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্য একাডেমিক ও মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রবণতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পশ্চিমা লেখকরা ইসলামকে সম্মান, কুসংস্কার ও পশ্চাৎপদতার সাথে জড়িত করতে চেয়েছে।

২. ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারে তাঁর কাজ

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করেছেন।

ক) ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতিরোধ

তিনি বিশ্বাস করতেন যে সাহিত্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম, যার মাধ্যমে ইসলামের মূল বার্তা ও দর্শন তুলে ধরা যায়। তাঁর রচিত উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গবেষণা গ্রন্থগুলো মুসলিম উম্মাহকে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে মুক্তির দীক্ষা দিয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ:

- *রোজা রক্ষা* (সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব)
- *ইসলামী সাহিত্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য চিন্তা* (দুই সাহিত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা)
- *দাওয়াতী সাহিত্য* (সাহিত্যকে ইসলামী দাওয়াতের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নীতি)

খ) ইসলামী শিক্ষার পুনর্জাগরণ

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্য শিক্ষার একচেটিয়া আধিপত্যের বিরুদ্ধে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তাঁর গবেষণায় ইসলামী শিক্ষার নিম্নলিখিত দিকগুলো উঠে এসেছে:

- ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সমন্বিত করা

- পাশ্চাত্য প্রভাবিত ইতিহাস চর্চার বিপরীতে সত্যনিষ্ঠ ইসলামী ইতিহাস প্রচার
- ইসলামী মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে শিক্ষার ভূমিকা

গ) ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সংরক্ষণ

তিনি মুসলিমদের নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন করার জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন, যেখানে মুসলিম বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও ইসলামী সভ্যতার গৌরবময় অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

৩. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাঁর সামাজিক আন্দোলন ও দাওয়াতি কাজ

নাজীব আল-কিলানী শুধুমাত্র লেখনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না; বরং তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও সক্রিয় ছিলেন। তিনি ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনে অংশ নেন এবং মুসলিম তরুণদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন।

ক) মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণে ভূমিকা

- ইসলামী চিন্তাবিদ ও তরুণ লেখকদের উৎসাহিত করা
- ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করা
- ইসলামী সভ্যতার পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানানো

খ) পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মোকাবিলায় মুসলিম মিডিয়ার গুরুত্ব

নাজীব আল-কিলানী পাশ্চাত্যের মিডিয়ার একচেটিয়া আধিপত্য মোকাবিলায় ইসলামী মিডিয়া প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মনে করতেন যে সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন, রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রকে ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারে ব্যবহার করা উচিত।

নাজিব আল-কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্ম, গবেষণা ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাব তুলে ধরেছেন এবং এর মোকাবিলায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার

আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর চিন্তা ও সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর জন্য আজও দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করছে। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে সাহিত্য, শিক্ষা ও ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্ব-সাহিত্যঙ্গনে ড. নাজিব আল কিলানীর অবস্থান

ড. নাজিব আল-কিলানী আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম প্রধান পুরোধা, যিনি সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্য শুধু আরব বিশ্বেই নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও সাহিত্য সমালোচক ও গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিলানী তাঁর রচনাগুলোর মাধ্যমে পশ্চিমা সাহিত্যিকদের দ্বারা প্রভাবিত বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে এক নতুন ধারা প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেখানে নৈতিকতা, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং ঐতিহাসিক চেতনার সমন্বয় ঘটেছে।

বিশেষত, উপনিবেশবাদ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং ইসলামী পুনর্জাগরণ নিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্ম মুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি পশ্চিমা একাডেমিক মহলেও গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। কিলানী পশ্চিমা সাহিত্যিকদের মতো কেবল বাস্তববাদ ও রোমান্টিকতার মোড়কে আবৃত সাহিত্য রচনা করেননি; বরং তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সংগ্রাম, আত্মপরিচয় এবং ইসলামী চেতনার পুনর্জাগরণের বার্তা দিয়েছেন। ফলে বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে তাঁকে একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিক ও ইসলামী পুনর্জাগরণের অন্যতম সাহিত্যিক সেনানী হিসেবে গণ্য করা হয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যে তাঁর অবস্থান সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ড. নাজিব আল কিলানী ও সমসাময়িক ইসলামী সাহিত্যিকদের মাঝে তার অবস্থান

১. মাহমুদ সামী আল বারুদী

মাহমুদ সামী আল বারুদীকে আরবী কবিতায় রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আহমদ শাওকী আধুনিক ধারার কাব্যগুলোতে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করেছেন। নিম্নে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবস্থান আলোচিত হলো।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বারুদী ১৮৩৯ সালে মিশরের কায়রো নগরীতে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের জন্মগ্রহণ করেন।^{১৮৬} বাল্যকালে তিনি নিজ গৃহেই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করেন। তিনি সামরিক ক্ষেত্রে ‘বাহজাবীহ’ (কোয়ার্টার মাস্টার সার্জেন্ট) স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্ত করেন এবং আরবী ব্যাকরণ, ভূগোল, গণিত, বীজগণিত, প্রকৌশল ইত্যাদি বিষয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন।^{১৮৭} ভাষাগত যোগ্যতার বিচারে তিনি তুর্কি ও ফারসি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।

তিনি প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তার মাতার নিকট অনেক বাস্তবিক শিক্ষা লাভ করেন। প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় তার মেধাকে উদ্দীপ্ত করে। তিনি বাল্যকাল থেকে আরবি কবিতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। পারিবারিক অনুপ্রেরণা থেকে তার কবিতার প্রতি ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি অবসর সময়ে আরবি কবিতার প্রাচীন গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন

^{১৮৬} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

^{১৮৭} প্রাগুক্ত।

করতেন। তিনি উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগের কবিদের কাব্য গভীরভাবে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করতেন।

তরুণ বয়সে তৎকালীন মিশরের সামাজিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির অবস্থা তাকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। এসব কারণে সামরিক বিভাগের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে চলে যান। ১৮৭৮ সালে তুরস্ক থেকে ফেরার পর তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যুক্ত হন এবং ১৮৮২ সালে তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসতে সক্ষম হন।^{১৮৮} তবে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঘাত ও প্রতিঘাতের ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে তাকে এ দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হয় এবং তিনি দীর্ঘকাল নির্বাসনে কাটাতে বাধ্য হন।^{১৮৯}

প্রায় পুরোটা জীবন সাহসিকতা ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার পর ১৯০৪ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।^{১৯০} তাকে বলা হতো **رب السيف و القلم** (অর্থাৎ অসি ও মসির কবি)।

তাঁর কবিতায় ইসলামের যে দিকগুলো দৃশ্যমান হয়, সেগুলো নিম্নরূপ-

১. ঈমান ও তাওহীদ
২. পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য
৩. রাসূল (সা:) এর প্রশংসা
৪. খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রশংসা
৫. সালাত
৬. জিহাদ
৭. সৃষ্টিতত্ত্ব
৮. মৃত্যু

^{১৮৮} ড. শাওকী দ্বইফ, *বারুদী: রা'ইদু শিরিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

^{১৮৯} প্রাগুক্ত।

^{১৯০} প্রাগুক্ত।

কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

উভয়ের কাব্য প্রতিভা এবং আধুনিক আরবী সাহিত্যে অবদান বিবেচনায় দুজনের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা পেশ করা হলো।

১. কবিতার বিষয়বস্তু

বারুদীর কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রাচীন ও আধুনিক কবিতার বৈশিষ্ট্যের সমাহার ঘটেছে। তিনি জাহিলী কবিদের মতো প্রিয়র ধ্বংসাবশেষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা দিয়ে কবিতার সূচনা করেছেন। আব্বাসী যুগের কবিতার অনুসরণে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি প্রেমগাঁথা কবিতায় নারীর সৌন্দর্য বর্ণনা দিতে প্রাচীন কবিদের মতো হরিনী, পূর্ণিমার চাঁদ, গোলাপ ফুল প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করেছেন।

তিনি প্রাচীন কবি-সাহিত্যিকদের রীতি অনুসরণ করলেও তাঁর কবিতায় আধুনিকতা ও নতুনতের ছাপ সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তিনি কবিতার ভাব, খেয়াল, বিষয়বস্তু, আবেগ-অনুভূতিতে বৈচিত্র এনেছেন। যেমন, বর্ণনামূলক কবিতায় প্রাকৃতিক দৃশ্য, বৃষ্টিস্নাত রাত, মেঘমালা, বিদ্যুত, বজ্র এবং মানুষের জীবনে এগুলোর প্রভাব কি তার বর্ণনাও সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রাম ও পল্লীর মনরোম দৃশ্যের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। কৃষিজাত পণ্য তুলা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদির বিবরণ কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

আল বারুদীর রাজনৈতিক কবিতায় যুলুম নির্যাতন ও সর্বপ্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে তার প্রচণ্ড ক্ষোভ ও প্রতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে। তাঁর কবিতায় ন্যায়, ইনসাফ, সুবিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠার তীব্র আবেগ অনুভূতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কবিতায় জালিমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্যে মানুষকে আহবান জানিয়েছেন। সামাজিক কবিতায় মিসরের সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। সমাজ সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের আহবান জানিয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

এর পাশাপাশি ইসলামী চেতনা, আধুনিক আবিষ্কার, সমকালীন প্রেক্ষাপট ইত্যাদি কবিতায় তুলে ধরেছেন। তিনি প্রাচীন ধারা থেকে বেরিয়ে এসে কবিতার ভাব ও রচনাশৈলিতে বৈচিত্র

এনেছেন। তার কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল প্রাচীন কাব্যরীতির মাঝেও আধুনিক চিন্তা চेतনার স্বার্থক রূপায়ন।^{১৯১}

২. ভাষাশৈলী ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য

বারুদীর অন্যতম অবদান কবিতার ভাষাগত ব্যবহারে নতুনত্ব। আব্বাসী যুগের পর দীর্ঘকাল যাবত কবিতায় জটিল আলংকারিক বাক্য, অপ্রয়োজনীয় কঠিন বিষয়, কোন কোন ক্ষেত্রে অশালীন ও নিকৃষ্ট বিষয়ের অবতারণা ইত্যাদি দোষ ত্রুটি থেকে তিনি আরবী কবিতাকে মুক্ত করে তাতে উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি সাধন করেন।^{১৯২} ঐতিহাসিক হান্না আল ফাখুরীর মতে, বারুদীর কবিতায় চারটি নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেগুলো হচ্ছে^{১৯৩}-

১. বর্ণনাভঙ্গির সূক্ষ্মতা
২. ভাষার সাবলীলতা
৩. কাব্যিক পরিচ্ছন্নতা
৪. কবিতা নির্মাণের দৃঢ়তা

এছাড়াও, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ড. শাওকী দ্বাইফ তাঁর রচনায় যে সকল বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলো হচ্ছে^{১৯৪}-

১. শব্দের দূর্বোধ্যতা পরিহার।
২. আধুনিক শব্দের ব্যবহার।
৩. সমার্থক ও ভিন্নার্থক শব্দের ব্যবহার।
৪. প্রাচীন কবিতা থেকে অনুপ্রবিষ্ট শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার।
৫. বাক্যে প্রাচীন পদ্ধতির অনুসরণ কিন্তু নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।
৬. বাক্যে উপমা ব্যবহারে বৈচিত্র্য।

^{১৯১} Jhon A. Haywood, Modern Arabic Literature (1800-1970), (London: Lund Humphries, 1971). P. 114.

^{১৯২} হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২৪-৯২৫।

^{১৯৩} প্রাগুক্ত।

^{১৯৪} ড. শাওকী দ্বাইফ, *বারুদী: রা'ইদু শিরিল হাদীস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৮।

৭. কবিতার ‘ওয়ন’ বা মাত্রা ব্যবহারে নতুনত্ব।

৮. ‘তিবাক’ বা পরস্পর বিপরীত দুটি অর্থকে একত্রীকরণ।

এ মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর ইসলামী রচনায়ও দৃশ্যমান হয়।

৩. সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব

মাহমুদ সামী আল বারুদীর কবিতায় সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কথা ফুটে উঠেছে। তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার উন্নয়ন, শিশুশিক্ষার সংস্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল। তবে কবি আহমদ শাওকীর তুলনায় রাজনীতিতে বারুদী অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। তিনি সরকার গঠন করতে সক্ষম হন, যদিও তা বেশিদিন টিকেনি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। শাওকীর লেখনীতে সমাজ ও রাষ্ট্রের জনগণের কথা ফুটে উঠলেও প্রত্যক্ষ প্রভাবের বিবেচনায় আধুনিক আরবী সাহিত্যে বারুদীই সবচেয়ে অগ্রগন্য।^{১৯৫}

৪. কবিতায় ইসলামী ভাবধারা

আরবী কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসারে কবি মাহমুদ সামী আল বারুদী এবং আহমদ শাওকীর মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব নয়। বরং, এ কথা বলা যেতে পারে যে, বারুদীর দেখানো পথে শাওকী আধুনিক কাব্যের বিকাশে এগিয়ে গেছেন। বারুদী কবিতার ভাষাগত ব্যবহারে যে নতুনত্ব এনেছেন, শাওকী তাতে আরো সমৃদ্ধি এনেছেন। ফলে উভয়েই নিজ নিজ রচনামূল্যের সৌন্দর্য্যে ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছেন। উভয়ের কবিতায়ই ইসলামী ঐতিহ্যের স্মরণ, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পুনর্জাগরণের প্রতি আহ্বান, ইসলামের ইতিহাসে

^{১৯৫} প্রাপ্ত।

বিভিন্ন ব্যক্তির ঐতিহাসিক ঘটনা ও সেগুলোর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা, তরুণ সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় জীবন গড়ার আহ্বান ইত্যাদি লক্ষণীয়।

২. হাফিজ ইবরাহীম

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে আধুনিক আরবী কবিতায় জাগরণ সৃষ্টিকারী প্রথম সারির কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাফিজ ইব্রাহিম। তিনি মিশরের একজন প্রখ্যাত কবি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম তিন দশক তার কাব্যচর্চার সময়কাল। তার কবিতায় স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। তার সৃজনশীল কাব্যিক প্রচেষ্টায় আধুনিক আরবি কবিতায় রেনেসাঁর গতি ত্বরান্বিত হয়। তিনি ১৮৭০ সালে মিশরের জন্ম গ্রহণ করেন।^{১৯৬}

তার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি।^{১৯৭} তিনি সাহিত্যের বইপত্র পড়ে মনের বিষন্নতা দূর করতেন। এক পর্যায়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে এবং জীবনের প্রতি হতাশা ও বিষন্নতা থেকে বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। তিনি পূর্ববর্তী কবিদের অনেক কবিতা মুখস্ত করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কবিতার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পেশ করে সুধি মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।^{১৯৮} এক পর্যায়ে তিনি বেশ কয়েকজন আইনজীবী সহকারী হিসেবেও কাজ করেন।^{১৯৯}

১৮৮৮ সালে তিনি আইনজীবীর পেশা ছেড়ে দিয়ে কায়রো সামরিক কলেজে ভর্তি হন।^{২০০} তিন বছর পর ১৮৯১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরির মাধ্যমে তাঁর সামরিক পেশাজীবন শুরু

^{১৯৬} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২।

^{১৯৭} আহমদ কাক্বিশ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

^{১৯৮} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

^{১৯৯} প্রাগুক্ত।

^{২০০} ড. শাওকী দ্বইফ, আল আদাবুল আরাবিয়্যাল মুয়াসির ফি মিসর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

হয়।^{২০১} ১৯০০ সালে বাধ্যতামূলক অবসরের মাধ্যমে তাঁর ঘটনাবহুল সামরিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এরপর তিনি প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহর সংস্পর্শে বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন কর্মসূচীতে অংশ নেন।^{২০২}

তিনি ১৯৩২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।^{২০৩} তার সাহিত্য রচনায় তাঁর ব্যক্তিজীবনের মতই উত্থান পতন লক্ষ্য করা যায়। তবে মিশরে ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে কবিতা রচনা শুরুর পর তার রচনায় মিশরের গণমানুষের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হয় এবং তিনি জনগণের কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তাঁকে বলা হয় *شاعر النيل* বা ‘নীল নদের কবি’।^{২০৪}

ইসলামী ভাবধারার প্রসারে অবদান পর্যালোচনা

কবিতায় ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রসারে হাফিজ ইবরাহীমের অবদান বহুমুখী। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচিত হলো:

১. কবিতা রচনার ধরণ ও বিষয়বস্তু

কবিতা রচনার ধরন ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে কবি হাফিজ ইবরাহীম ছিলেন বৈচিত্র্য ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল অনেক বিস্তৃত। তিনি একাধারে রোমান্টিসিজম ও প্রকৃতিপ্রেম থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কলম ধরেছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি কবি আহমদ শাওকীর মতই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। তাঁর কাব্য রচনার বিষয়বস্তু অনেক বিস্তৃত। বিষয়গুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা যায়:

- দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা
- রাজনীতি

^{২০১} প্রাপ্ত।

^{২০২} আহমদ হাসান যাইয়্যাত, প্রাপ্ত, পৃ. ৩৭৩।

^{২০৩} প্রাপ্ত।

^{২০৪} প্রাপ্ত।

- সামাজিকতা
- স্তুতি ও প্রশংসা
- শোকগাঁথা
- প্রহসন
- রোমান্টিসিজম
- ঐতিহাসিক ঘটনাকেন্দ্রিক কবিতা

এ বিস্তৃত বিষয়ে রচনার ক্ষেত্রে তিনি ভাষাশৈলী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও সমসাময়িক অধিকাংশ কবিকে ছাড়িয়ে গেছেন, তিনি অতি আত্মবিশ্বাসের সাথেই নিজেকে যুগশ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন।^{২০৫} তবে কবি আহমদ শাওকীর প্রতি তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি তাঁর প্রশংসায় কবিতাও রচনা করেছেন।^{২০৬} প্রকৃতপক্ষে হাফিজ ইবরাহীম আহমদ শাওকী ব্যতীত আর কাউকে নিজের সমকক্ষ মনে করতেন না।

২. ভাষাশৈলী ও ভাবগত বৈশিষ্ট্য

কবি হাফিজ ইবরাহীম কাব্য প্রতিভায় অনন্য। রচনাশৈলী ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন যথেষ্ট সাবলীল। তাঁর সহজবোধ্য রচনায় তিনি আবেগকে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুচারুরূপে।^{২০৭} তাঁর রচনাবলির দিকে তাকালে যেখা যায়, প্রশংসামূলক, রোমান্টিক ও প্রহসনমূলক, অতীতের প্রতি আক্ষেপ ও অভিযোগ ইত্যাদি বিষয় ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে রূপক ও কাল্পনিক বাক্যের ব্যবহার করেছেন অসামান্য দক্ষতার সাথে।

৩. সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব

কবি হাফিজ ইবরাহীমের কবিতায় সমকালীন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে কথা ফুটে উঠেছে। যেমন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি,

^{২০৫} মো: মাহফুজুল করীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

^{২০৬} প্রাগুক্ত।

^{২০৭} ড. ত্বহা হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, মাতৃভাষার উন্নয়ন, শিশুশিক্ষার সংস্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অসামান্য।

৪. বৈচিত্র্য ও বহুমুখীতা

কাব্য রচনায় বৈচিত্র্য আনয়নে হাফিজ ইবরাহীম অনন্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি মানুষের জীবনমুখী বিভিন্ন দিক নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তবে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত অবদানের কথা বলতে গেলে আহমদ শাওকী হাফিজ ইবরাহীমকে ছাড়িয়ে গেছেন। বিশেষত আরবী কবিতায় সুবিশাল ভাণ্ডার তৈরির পরও গদ্য সাহিত্যে অবদান এবং কাব্যনাট্যের মত নতুন একটি শাখাকে স্বতন্ত্র রূপদান করে আহমদ শাওকী যে বহুমুখী পদচারণার স্বাক্ষর রেখেছেন, হাফিজ যে স্থানে নিজেকে পৌঁছাতে সক্ষম হননি। যদিও তাঁর রচনাসম্ভার সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মধ্যে সমৃদ্ধ।^{২০৮}

৫. কবিতায় ইসলামী ভাবধারা

আরবী কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের বিস্তারে কবি হাফিজ ইবরাহীম এবং আহমদ শাওকীর মধ্যে কাউকে প্রাধান্য দেওয়া দুঃসাধ্য। উভয়েই নিজ নিজ প্রতিভায় ও রচনানৈলীর সৌন্দর্য্যে ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করেছেন। উভয়ের কবিতায়ই ইসলামী ঐতিহ্যের স্মরণ, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পুনর্জাগরণের প্রতি আহ্বান, ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তির ঐতিহাসিক ঘটনা ও সেগুলোর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলা, তরুণ সমাজকে ইসলামী ভাবধারায় জীবন গড়ার আহ্বান ইত্যাদি লক্ষণীয়। যেমন, হাফিজ ইবরাহীমের এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে:

১. কবি হাফিজ ইবরাহীম উমর (রা:) কে নিয়ে **عمر بن الخطاب** নামক কবিতা রচনা করেছেন। এখানে কবি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার মর্মস্পর্শী বিবরণ সহ তাঁর জীবনচরিতের নানা দিক ফুটিয়ে তুলেছেন।^{২০৯}

^{২০৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫।

^{২০৯} হাফিজ ইবরাহীম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

২. মিশরের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়খ মুহাম্মদ আবদুলহু (১৮৪৯-১৯০৫ খৃ.) এর স্মরণে বেশ কয়েকটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর কাব্য সংকলন ‘দীওয়ানে হাফিজ’ এ শায়খ আবদুলহুর স্মরণে ৭টি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।^{২১০}
৩. তিনি উসমানীয় সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা উসমান বিন আরতুগ্রুলের জীবন চরিত ও উসমানী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে কবিতা রচনা করেন।^{২১১}
৪. মিশরের উপনিবেশবাদ বিরোধী আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের জীবন ও কর্ম নিয়েও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন।
৫. ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, শিশুশিক্ষার উন্নয়ন, নারীশিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

৩. মারুফ রুসাফী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হাফিজ ইবরাহীমের সমসাময়িক কবি মারুফ রুসাফী ১৮৭৫ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন।^{২১২} তিনি আধুনিক আরবী কাব্যে রেনেসাঁর অন্যতম অগ্রপথিক। তিনি মাহমুদ সামী আল বারুদী, হাফিজ ইবরাহীম, আহমদ শাওকী প্রমুখ কবিদের থেকে ভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মেও সাহিত্য সাধনায় তাঁদের সাথে নিজেকে এক কাতারে নিতে সক্ষম হয়েছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া এই কবি প্রাথমিক শিক্ষান্তরেই পবিত্র কুরআনের হিফয সম্পন্ন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে তিনি রশীদিয়াহ সামরিক স্কুলে ভর্তি হন।^{২১৩} পরবর্তীতে সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত না করেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিনি শিক্ষা অর্জনেই আত্মনিয়োগ করেন। সামরিক স্কুল ত্যাগের পর তিনি বাগদাদে তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিম মাহমুদ শূকরী আল আলুনী সহ একাধিক বিজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে আরবী ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, ফিকহ, মানতিক, আইন, কালামশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে

^{২১০} প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১।

^{২১১} প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০।

^{২১২} হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১৫।

^{২১৩} ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *হাফিজ ইব্রাহীম ও মারুফ আর রুসাফীর কাব্য প্রতিভা*, (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১৯৯৪), পৃ. ১৯-২০।

শিক্ষালাভ করেন।^{২১৪} পরবর্তীতে এসকল বিষয়ে নিজ প্রচেষ্টায় অধ্যয়ন ও গবেষণা চলমান রাখেন।

তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন।^{২১৫} পরবর্তীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে দামেস্ক ও জেরুজালেমে আরবী বিষয়ে অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯২১ সালে তিনি ইরাকে ফিরে আসেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে গ্রন্থ প্রণয়ন, অনুবাদ ও সম্পাদনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে প্রায় দেড় বছর দায়িত্ব পালন করেন। এরপর ১৯২৩ সালে ‘আল-আ’মাল’ নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।^{২১৬}

পরবর্তীতে তিনি আবারও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একে একে আরবী ভাষা বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক, টিচার্স ট্রেনিং কলেজের আরবী বিষয়ের অধ্যাপক এবং শিক্ষা সংস্কার কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৮ সালে তিনি সকল প্রকার সরকারি চাকুরি ছেড়ে দেন।^{২১৭} চাকুরিজীবন শেষে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন একাধিকবার সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।^{২১৮} বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ কবি ১৯৪৫ সালে ইন্তেকাল করেন।

কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার

তাঁর রচনামূল্য ছিল সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল। তিনি কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে বারুদীকে অনুসরণ করতেন। তিনি ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত একজন কবি ছিলেন। তার কবিতার বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি সৃষ্টি জগতের রহস্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছেন, সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন, ঐতিহাসিক ঘটনার উপর তিনি কবিতা রচনা করেছেন

^{২১৪} আহমদ কাকিষ, *তারিখুশ শিরিল আরাবিয়্যল হাদীস*, প্রাপ্তকৃত, পৃ. ৪০০।

^{২১৫} প্রাপ্তকৃত।

^{২১৬} হান্না আল ফাখুরী, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, প্রাপ্তকৃত, পৃ. ১০১৬।

^{২১৭} মুহাম্মদ ইউসুফ কোকেন, *আ’লামুন নাহরি ওয়াশ শিরি ফিল আসরিল আরাবিয়্যল হাদীস*, (মাদ্রাজ: হাফিজা হাউজ প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স, ১৯৮৪), পৃ. ৩১৮।

^{২১৮} প্রাপ্তকৃত।

এবং তার আরো অনেক কবিতা ছিল বর্ণনামূলক। তার বিস্তৃত রচনা পরিধির মধ্য থেকে যে বিষয়গুলোকে ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায় সেগুলো হচ্ছে-

১. কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতার আহ্বান
২. জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান
৩. দেশাত্মবোধ
৪. জুলুম নিপীড়নের বিরোধিতা
৫. সংকাজে উৎসাহ প্রদান
৬. রাসুল (সা:) এর প্রশংসা
৭. সৃষ্টিজগতকে নিয়ে ভাবনা
৮. কবিতায় আল কুরআনের প্রভাব
৯. মাতৃ শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি

উক্ত বিষয়গুলোতে রচিত কবিতার প্রতিটিতেই তিনি তার ইসলামী মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তার রচনার এই বৈশিষ্ট্যগুলো আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তাকে বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। তবে কবি আহমদ শাওকীর সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনায় বলা যায়, শাওকী তার তুলনায় কবিতার রচনার বিস্তৃতির দিক থেকে অধিক অগ্রসর ছিলেন। আধুনিক আরবী সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন ইসলামী সাহিত্য। ইসলামী মূল্যবোধে কবিতার রচনার প্রচলন আরবী কাব্যের ইতিহাসের সূচনা কাল থেকে থাকলেও আধুনিক আরবী সাহিত্যে একে স্বতন্ত্র হিসেবে উপস্থাপন করা এ যুগের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এবং এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাহমুদ সামী আল বারুদী ও আহমদ শাওকী। শাওকীর সমসাময়িক অন্যান্য কবিগণের মধ্যে শুধুমাত্র বারুদীকেই তার সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হয়।

৪. আহমদ শাওকী

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কবি আহমদ শাওকী সে সব কবির অন্যতম যাদের হাতে আধুনিক আরবী কাব্য সাহিত্য প্রতিপালিত হয়েছে এবং আরবী কবিতা পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি ১৮৬৮ সালে ১৬ই অক্টোবর মিসরের রাজধানী কায়রোতে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আরবীয়, মাতা তুর্কী, পিতামহী কুর্দি এবং মাতামহী গ্রীক বংশোদ্ভূত। এভাবে চারটি পৃথক সংস্কৃতি তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি মাত্র তিন বছর মাতৃস্নেহে লালিত-পালিত হন। এরপর তার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার নানী ‘তিমযার’^{২১৯}। তিনি খেদিভ ইসমাইল পাশার রাজপ্রাসাদের একজন গৃহকর্মী ছিলেন। ফলে তার শৈশবকাল প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়।

শাওকী চার বছর বয়স থেকে মক্তবে (প্রাথমিক বিদ্যালয়) যাতায়ত শুরু করেন এবং মাত্র পনের বছর বয়সের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন।^{২২০} অতঃপর ১৮৮৫ সালে আইন কলেজে ভর্তি হলে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে আইন বিষয়ে লেখা পড়া করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠে। ফলে তিনি দ্রুত চাকুরী লাভের আশায় সেখানকার অনুবাদ বিভাগে দুই বছর অধ্যয়ন করে ১৮৮৭ সালে অনুবাদশাস্ত্রে চূড়ান্ত ডিগ্রী লাভ করেন।^{২২১}

অনুবাদ বিভাগে অধ্যয়নকালে আরবী সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক শায়খ মুহাম্মাদ বসয়ুণীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। এ সময় তার মধ্যে প্রগাঢ় কাব্যানুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন।^{২২২} আইন কলেজের লেখাপড়া শেষে সরকারী অর্থায়নে তিনি আইন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে ১৮৮৭ সালে ফ্রান্স গমন করেন এবং

^{২১৯} ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*, গবেষণা অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ১৪৭।

^{২২০} আব্বাস হাসান, *আল মুতানাব্বী ওয়া শাওকী*, (কায়রো: দারুল মা’আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩), পৃ. ৪১।

^{২২১} ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

^{২২২} ড. শাওকী দ্বইফ, *শাওকী: শা’ইরুল আসরিল হাদীস*, (কায়রো: দারুল মা’আরিফ, ১২শ সংস্করণ, ১৯৫৩), পৃ. ১৩।

লেখাপড়া শেষে ১৮৯১ সালে মিসরে ফিরে এসে রাজপ্রাসাদে চাকুরী গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি তার জীবনের বিশটি বছর রাজপ্রাসাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে কবির সাথে জনগণের তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না।^{২২৩}

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কবিকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেয়। ফলে কবি ১৯১৪ সাল থেকে যুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময় স্পেনে কাটান।^{২২৪} এই সময়ে তার মধ্যে জন্মভূমি মিসরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভালবাসার সৃষ্টি হয়। তাঁর মধ্যে তীব্রভাবে দেশপ্রেম জেগে উঠে। ফলে তিনি মিসরের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা রচনা করেন। ১৯১৯ সালে দেশে ফিরে আসার পর তিনি মিসরের রাজনৈতিক অবস্থায় বিরাট পরিবর্তন দেখতে পান। ফলে তিনি রাজপ্রাসাদের পরিবর্তে জনগণের কাতারে সামিল হন এবং জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তাদের মৌলিক সমস্যাবলী কবিতায় তুলে ধরেন।^{২২৫}

কবি আহমাদ শাওকীর নির্বাসন পরবর্তী জীবন পূর্বের জীবনের তুলনায় অনেক ব্যতিক্রম। নির্বাসনের পূর্বে তিনি শাসকদের স্তুতিমূলক কাব্যে সময় ব্যয় করতেন। কিন্তু নির্বাসন থেকে ফিরে তিনি জনগণের কবি হয়ে উঠেন। দেশ ও জাতির উন্নয়নে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় তাঁর রচিত কবিতাগুলো সর্বমহলে প্রসংশিত হয়। পরবর্তীতে ১৯২৪ সালে তিনি মিশরের জাতীয় সংসদের উচ্চ পরিষদ ‘মাজলিসুস শুয়ুখ’ এর সদস্যপদ লাভ করেন।^{২২৬} তিনি আমৃত্যু এ পদে বহাল ছিলেন।

^{২২৩} ইউসুফ আতা তুরাইফী, *আমিরুস গুয়ারা আহমদ শাওকী: হায়াতুহ ওয়া শিরুহ*, (আম্মান: আল আহলিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯), পৃ. ১২।

^{২২৪} ড. মুহাম্মদ রুহুল আমীন, *আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

^{২২৫} ড. আহমদ আলী, *আধুনিক আরবী কাব্যের ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: আল আকীব প্রকাশনী, ২০০৪), খ. ১, পৃ. ১৭০।

^{২২৬} প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তার চেতনায় উজ্জীবিত লেখনীর দরুন ১৯২৭ সালে কায়রোর শাহী অপেরা হাউজে তাঁর দীওয়ান ‘আশ-শাওকীয়াত’ এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় তাঁকে ‘আমীরুশ শূয়ারা’ বা কবিসম্রাট উপাধিতে ভূষিত করা হয়।^{২২৭}

কবি আহমাদ শাওকী ১৯৩২ সালের ১৪ই অক্টোবর ৬৪ বছর বয়সে ফুসফুসের সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর কবরের ফলকে তাঁর সাহিত্যজীবনের অন্যতম অমর কীর্তি **البردة** কবিতার নিম্নোক্ত চরণদুটি লিখে দেওয়া হয়, যাতে তিনি রাসূল (সা:) এর ওসিলায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন-

يا أحمد الخير، لي جاه بتسميتي وكيف لا يتسامي بالرسول سمي
إن جل ذنبي عن الغفران لي أمل في الله يجعلني في خير معتصم^{২২৮}

অর্থ: হে সর্বাধিক প্রশংসিত ও সর্বোত্তম আহমদ! আমার নামে রয়েছে আমার গৌরব, আর কেনই বা আমার নাম গৌরবান্বিত হবে না, যদিও আমার পাপরাশি ক্ষমার চেয়ে বেশি, তবুও আল্লাহর কাছে আমার আশা যে, তিনি আমাকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

কবি আহমদ শাওকী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করায় তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়। পাশাপাশি তার কবিতায় আব্বাসী যুগের প্রভাব লক্ষণীয়। আবু নুওয়াস, বুহতুরী, আবু তাম্মাম, মুতানাব্বী প্রমুখ কবিদের বাক্যশৈলীর প্রভাব রচনায় দৃশ্যমান। অন্যদিকে ফরাসি নাট্য সাহিত্যের প্রভাব তার কাব্যনাট্যে পড়ে। সর্বোপরি তার রচনায় প্রাচীন ও আধুনিকতার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে কবিতা রচনা করেন। তার কবিতায় দেশাত্মবোধ, রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস অনুধাবন, ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজের নানা দিক নিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কবিতা রচনা করেছেন। তার কবিতায় বিদ্যমান ইসলামী শিক্ষার উপাদান নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হলো।

^{২২৭} হাম্মা আল ফাখুরী, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল আরাবী- আল আদাবুল হাদীস*, (বৈরুত: দারুল জিল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬), পৃ. ৪৩৯।

^{২২৮} আহমদ শাওকী, *আশ শাওকীয়াত*, প্রাপ্ত, পৃ. ২২০।

ঈমান ও তাওহীদ

তিনি একজন সচেতন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। তার রচিত অসংখ্য কবিতায় তার ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় ঈমান ও তাওহীদের যে দিকগুলো প্রতীয়মান হয় সেগুলোর সংক্ষিপ্ত উদাহরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বহু আয়াতে মানুষকে তাঁর সৃষ্টিজগত নিয়ে ভাবার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলত, আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্ব ও কুদরতের প্রতি বিশ্বাসের জন্য শুধু তার সৃষ্টিরাজির সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করাই যথেষ্ট। বিবেকবানদের জন্য এর চেয়ে বেশি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। এই মর্ম ফুটে উঠেছে কবি আহমদ শাওকীর নিম্নোক্ত কবিতায়-

تلك الطبيعة قف بنا يا ساري	حتى أريك بديع صنع الباري
الأرض حولك والسماء اهتزنا	لروايت والآيات والآثار
من كل ناطقة الجلال كأنها	أم الكتاب على لسان القاري
دلت على ملك الملوك فلم تدع	لا ذلة الفقهاء والأجساد ^{২২৯}

অর্থ: ঐ মনোরম প্রকৃতি কতই না সুন্দর। হে সারেং, তুমি আমাদের নিয়ে একটু থামো। যেন আমি তোমাকে স্রষ্টার আশ্চর্য সৃষ্টি দেখাতে পারি। তোমার চারপাশের নিদর্শনাবলির দ্বারা আকাশ ও পৃথিবী আন্দোলিত হচ্ছে। এর প্রত্যেকেই আল্লাহর মহিমা এমনভাবে ব্যক্ত করছে, যেন তা ক্রুরীর কণ্ঠে আল কুরআনের ধ্বনি। এগুলো বাদশাহদের বাদশার অস্তিত্ব প্রমাণ করছে। সুতরাং, পণ্ডিত ও বিবেকবানদের জন্য আর প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

২. নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালা মানুষের হেদায়তের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। মুসলমান মাত্রই এর প্রতি ঈমান রাখা আবশ্যিক। কবি আহমদ শাওকীর কবিতায় ঈমানের এ মৌলিক বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, তিনি একটি কবিতায় বলেন-

أرسلت بالتورات موسى مرشدا	وابن البتول فعلم الإنجيلا
---------------------------	---------------------------

^{২২৯} আহমদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫।

وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا^{২৩০}

অর্থ: আপনি মুসা (আ:) কে তাওরাত দিয়ে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়েছেন, এবং মারিয়ামের পুত্র (ঈসা (আ:)) কে, তিনি ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছেন। এবং মুহাম্মদ (সা:) কে প্রাঞ্জল বর্ণনার ঝর্ণাধারা হিসেবে প্রবাহিত করেছেন। অতঃপর তিনি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা মানুষকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

৩. তাকদীরের প্রতি ঈমান

তাকদীর ঈমানের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এবং তাকদীরের নির্ধারিত বিষয়গুলোর অন্যতম হচ্ছে মৃত্যু। এর ফয়সালা মানুষের আওতাধীন নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায়ই এটি ঘটবে। এ বিশ্বাস প্রতিটি মুসলমানের জন্য জরুরি। কবির পিতার মৃত্যুর পর শোকগাঁথা রচনা করতে গিয়ে তিনি এ বিষয়টি তুলে ধরেন-

يا أبي ما أنت في ذا أول هلكت قبلك ناس و قري
كل نفس للمنايا فرض عين و نعي الناعون خير الثقلين^{২৩১}

অর্থ: হে পিতা! আপনিই এ (মৃত্যুর) ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি নন। প্রতিটি আত্মার জন্য মৃত্যু ফরজে আইন (অবধারিত)। আপনার পূর্বে অনেক মানুষ ও জনপদ (মৃত্যুর দ্বারা) ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

আর দো-জাহানের সর্বোত্তম মানুষের জন্যও মানুষ কেঁদেছে।

৪. আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া

প্রতিটি ঈমানদারের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিয়ামতরাজির প্রতি শুকরিয়া আদায় করা আবশ্যিক। শুকরিয়ার দ্বারা নিয়ামত বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে শুকরিয়া আদায় না করলে তার জন্য শাস্তি অবধারিত। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন-

لئن شكرتم لأزيدنكم^{২৩২} وَلئن كفرتم إن عَذَابِي لَشَدِيدٌ^{২৩৩}

^{২৩০} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ২১৫।

^{২৩১} প্রাণ্ডক্ত, পৃ. ৭০৭।

^{২৩২} আল কুরআন, সূরা ইবরাহীম - ৭।

অর্থ: যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামাত) বৃদ্ধি করে দেব, আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও (তবে জেনে রেখ, অকৃতজ্ঞদের জন্য) আমার শাস্তি অবশ্যই কঠিন।

পবিত্র কুরআনের এ নির্দেশের মর্ম অনুভব করে কবি আহমদ শাওকী তার একটি কবিতায় উল্লেখ করেন-

أحمد الله و أطري الأنبياء مصدر الحكمة طرا والضياء
وله الشكر على نعم الوجود وعلى نلت من فضل وجود^{২৩৩}

অর্থ: আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি এবং নবীদেরও, যারা জ্ঞান ও আলোর উৎস। সৃষ্টিজগতের অনুগ্রহরাজির জন্য এবং আমার অস্তিত্বের জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

রাসূল (সা:) এর প্রশংসা ও তাঁর জীবনাদর্শের আলোচনা

কবি আহমদ শাওকী রাসূল (সা:) এর প্রশংসায় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী দুটি কবিতা রচনা করেন। উক্ত দুটি কবিতার কারণে তিনি আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তার একটি কবিতা হচ্ছে ইতিহাসখ্যাত ‘কাসিদাতুল বুরদাহ’^{২৩৪} অনুসরণে লেখা ‘নাজুল বুরদাহ’ এবং অপরটি হচ্ছে ‘হামযিয়াতুন নাবাবিয়াহ’। বিশেষত ‘হামযিয়াতুন নাবাবিয়াহ’ কবিতাটিতে তিনি রাসূলের প্রশংসার পাশাপাশি জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরেছেন। ফলে এই কবিতাটি কে শুধুমাত্র প্রশংসাসূচক কবিতা বললে তা কম বলা হয়। বরং একে কাব্যের ভাষায় রচিত একটি গভীর তাত্ত্বিক সিরাত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই কবিতায় প্রশংসাসূচক বাক্যের মাধ্যমে তিনি রাসূলের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ আদর্শগুলোকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

^{২৩৩} আহম শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৯।

^{২৩৪} রাসূল (সা:) এর প্রশংসায় ইমাম বুসিরি (রহ:) রচিত কাব্য। যার মূল নাম ‘আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ ফী মাদাহি খাইরিল বারিয়াহ’।

নিম্নে তার এই কবিতার উল্লেখযোগ্য কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

১. রাসূল (সা:) কে পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে আখ্যায়িত করণ:

এই কবিতার শুরুতে কবি রাসূল (সা:) কে পথ প্রদর্শনকারী বলে উল্লেখ করেছেন। এবং তার আগমনে গোটা দুনিয়া আলোকিত এবং হাস্যজ্জল হয়েছে বলে তার কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন: তিনি বলেন,

وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءٌ وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَنَّاءٌ^{২৩৫}

অর্থ: হেদায়েতকারী জন্মলাভ করেছেন, ফলে সৃষ্টিজগত আলোকিত হয়েছে। এবং কালের মুখে হাসি ও তাঁর প্রশংসা (ছড়িয়ে পড়েছে)।

২. তাঁর উপর নাযিলকৃত ওহীর মহত্ত্ব বর্ণনা:

রাসূল (সা:) এর উপর নাযিলকৃত ওহী তথা কুরআনের শান ও উচ্চমর্যাদার বিষয়টি তিনি এই কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত গভীরতাত্ত্বিক ভাষায়। যেমন, তিনি বলেন:

وَحَدِيقَةُ الْفُرْقَانِ ضَاحِكَةُ الرُّبَا بِالثَّرْجُمَانِ شَذِيَّةٌ غَنَاءٌ
وَالْوَحْيُ يَقْطُرُ سَلْسَلًا مِنْ سَلْسَلٍ وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ الْبَدِيعُ رِوَاءٌ^{২৩৬}

অর্থ: ভাষ্যকারের গুণে আল-কুরআনের বাগিচায় সমুজ্জল টিলার সৃষ্টি হয়েছে এবং বাগিচাটি সৌরভমণ্ডিত ও সঙ্গীতমুখর হয়ে উঠেছে। শীতল মিষ্টি পানির মতো অল্প অল্প করে ওহী নাজিল হচ্ছে, আর ফলক ও তার অপূর্ব লেখনী ভাস্বর হয়ে আছে।

৩. আল্লাহ তায়ালায় পরেই তাঁর মর্যাদার স্থান:

রাসূল (সা:) এর মর্যাদা আল্লাহ তায়ালায় পরেই। এ বিষয়টি তার কবিতায় ফুটে উঠেছে:

إِسْمُ الْجَلَالَةِ فِي بَدِيعِ حُرُوفِهِ أَلِفٌ هُنَالِكَ وَإِسْمُ طَهَ الْبَاءِ^{২৩৭}

^{২৩৫} আহমদ শাওকী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

^{২৩৬} প্রাগুক্ত।

^{২৩৭} প্রাগুক্ত।

অর্থ: চমৎকার হরফসমূহের মধ্যে আল্লাহর নাম ‘আলিফ’ (অর্থাৎ প্রথম স্থানে) এবং মুহাম্মদ (সা:) এর নাম ‘বা’ (অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানে)।

৪. তাঁর আবির্ভাবে সত্য বাণীর মর্যাদা সবকিছুর উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে:

রাসূল (সা:) এ আবির্ভাবের ফলে সত্যের মর্যাদা সকল কিছুর উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছে। এ বিষয়টি কবি তার কাব্যের ছন্দে তুলে ধরেছেন এভাবে:

الْحَقُّ عَالِي الرُّكْنِ فِيهِ مُظَفَّرٌ فِي الْمُلْكِ لَا يَعْلُو عَلَيْهِ لَوَاءٌ
২৩৮

অর্থ: সত্য সেদিন উচ্চ স্তম্ভ বিশিষ্ট ও বিজয়ী হলো, গোটা রাজ্যে আর কোন পতাকা সেদিন তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়নি।

৫. তাঁর আগমানে জালিমের মসনদ কম্পিত:

তাঁর আগমানে জালিমের মসনদ কম্পমান ও ধ্বংসপ্রায়। এ বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে:

دُعِرَتْ عُرُوشُ الظَّالِمِينَ فَرُزِلَتْ وَعَلَتْ عَلَى تيجَانِهِمْ أَصْدَاءُ^{২৩৯}

অর্থ: জালিমের সিংহাসন ভয় কেঁপে উঠল এবং তাদের মুকুটের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠলো।

৬. তাঁর সুমহান চারিত্রিক গুণের প্রশংসা:

রাসূল (সা:) এর চারিত্রিক মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কবি বলেন,

يَا مَنْ لَهُ الْأَخْلَاقُ مَا تَهْوَى الْعُلَا مِنْهَا وَمَا يَتَعَشَّقُ الْكُبَرَاءُ
لَوْ لَمْ تُقَمْ دِينًا لَقَامَتْ وَحْدَهَا دِينًا تُضِيءُ بِنُورِهِ الْآنَاءُ^{২৪০}

অর্থ: হে এমন চারিত্রিক গুণের অধিকারী! যার খানিকটাও কোনো উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি আশা করতে পারে না। তুমি যদি কোন দ্বীন প্রতিষ্ঠা নাও করতে, তবে ওই উত্তম চরিত্রই একটি দ্বীন হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেত, এবং তার আলোয় সৃষ্টি জগত আলোকিত হতো।

^{২৩৮} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

^{২৩৯} প্রাগুক্ত।

^{২৪০} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৭. যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্বপূর্ণ পদচারণা:

যুদ্ধের ময়দানে তাঁর বীরত্বপূর্ণ পদচারণার কথা কবিতায় বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা:) এর গোটা জীবনের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এর বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়। কবির ভাষায়:

وَإِذَا مَشَيْتَ إِلَى الْعِدَا فَعُضْنَفُ ۖ
وَإِذَا جَرَيْتَ فَأِنَّكَ النِّكَبَاءُ ۖ^{২৪১}

অর্থ: তুমি যখন শত্রুর দিকে পা বাড়াও তখন একটি সিংহে পরিণত হও, আর যখন ধাবমান হও
তখন দমকা হাওয়ায় পরিণত হও।

৮. তাঁর বিরোধীতের নিন্দা:

যারা রাসূল (সা:) এর বিরোধীতা করে তাঁকে কবি বা যাদুকর বলে আখ্যায়িত করতো, তাদের কথার বিরোধীতাও কবি ফুটিয়ে তুলেছেন পবিত্র কুরআনের ভাবধারা অনুসারে। কবির ভাষায়:

حَسَدُوا فَقَالُوا شَاعِرٌ أَوْ سَاحِرٌ ۖ
وَمِنَ الْحَسَوِدِ يَكُونُ الْإِسْتِهْزَاءُ ۖ^{২৪২}

অর্থ: তারা তাকে হিংসা করেছে, তাই বলেছে, এ একজন কবি, না হয়তো একজন জাদুকর।

হিংসুকদের পক্ষ থেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ সংঘটিত হয়েছে।

ইসলামী জীবন সম্পর্কিত আলোচনা

কবি আহমদ শাওকীর বেশ কিছু কবিতায় ইসলামী জীবনবিধানের বিভিন্ন দিকের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। তিনি কবিতার মাধ্যমে তরুণ সমাজকে কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরা এবং সালাফদের অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন-

خُذْ بِالْكِتَابِ وَبِالْحَدِيثِ ۖ
وَرَجِعْ إِلَى سَفْنِ الْحَلِيقَةِ ۖ
وَسِيرَةَ السَّلَفِ الثَّقَاتِ ۖ^{২৪৩}
وَاتَّبِعْ نَظْمَ الْحَيَاةِ ۖ

অর্থ: তুমি কুরআন, হাদীস ও সালাফদের নির্ভরযোগ্য জীবনীকে আঁকড়ে ধরো। এবং সং

চরিত্রের নীতিমালার দিকে প্রত্যাবর্তন কর এবং জীবনের নীতিকে অনুসরণ কর।

^{২৪১} প্রাগুক্ত।

^{২৪২} প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

^{২৪৩} প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮।

ড. নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যিক দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তিনি সাহিত্যকে শুধুমাত্র শৈল্পিক বা বিনোদনমূলক মাধ্যম হিসেবে দেখেননি; বরং একে তিনি দাওয়াহ, সংস্কার ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর লেখার মূল লক্ষ্য ছিল:

- **ইসলামী শিক্ষা ও দাওয়াহ:** তিনি সাহিত্যকে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অনেক রচনায় নবীজি (সা.)-এর জীবন, সাহাবাদের চরিত্র এবং ইসলামী মূল্যবোধের কথা বিশদভাবে উঠে এসেছে।
- **সামাজিক ও নৈতিক সংস্কার:** সমাজের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন এবং পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর অবস্থান নিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক দর্শন ছিল সমাজকে ইসলামী মূল্যবোধে ফিরিয়ে আনা।
- **প্রতিরোধ ও সংগ্রামের চেতনা:** অন্যান্য লেখকদের তুলনায় তিনি বেশি জোর দিয়েছেন জিহাদ, আত্মত্যাগ এবং প্রতিরোধের উপর। তাঁর উপন্যাস ‘আর-রিজাল ফি আশ-শামস’ এবং ‘আল-ইকতিহাম’ মুজিকামী মুসলিম জাতির জন্য এক অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত।
- **পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব প্রতিহত করা:** অন্যান্য আধুনিক আরবি সাহিত্যিকদের মতো তিনি পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাবকে গ্রহণ করেননি; বরং পাশ্চাত্য জীবনধারার নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য দর্শনের অন্যতম ভিত্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। তাঁর রচনায় প্রায়শই ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মাওতু ইলাল আবাদ’-এ তিনি পাশ্চাত্য জীবনধারার অন্ধ অনুসরণের ক্ষতিকর দিক তুলে ধরেন এবং মুসলিমদের আত্মপরিচয় রক্ষার আহ্বান জানান।

২. রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা

নাজীব আল-কিলানী সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার প্রসার ঘটিয়েছেন। তার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং তিনি সমকালীন রাজনৈতিক অন্যায়ে, সামাজিক অবক্ষয় ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। অন্যদিকে, মাহমুদ সামী আল-বারুদী, আহমদ শাওকী, হাফিজ ইব্রাহীম ও মারুফ রুসাফীর সাহিত্যেও রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, তবে তাদের চিন্তাধারার মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই আলোচনায় তাদের সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য ও নাজীব আল-কিলানীর তুলনামূলক অবস্থান তুলে ধরা হলো।

রাজনৈতিক চেতনা: ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ও জাতীয়তাবাদ

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্য ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। তার রচনায় দেখা যায়, তিনি রাজনৈতিক দুর্নীতি, স্বৈরশাসন এবং পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি লেখনী পরিচালনা করেছেন। বিশেষ করে তার "আল-ইনসান আল-জাদিদ" (নতুন মানুষ) এবং "ফি আযযিল-হুররিয়া" (স্বাধীনতার ছায়ায়) উপন্যাসগুলোতে আধুনিক রাজনৈতিক সংকট ও পশ্চিমা প্রভাবের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর জাগরণের আহ্বান ফুটে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা ব্যতীত সমাজে প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

অপরদিকে, মাহমুদ সামী আল-বারুদীর সাহিত্য ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন এবং আরবদের স্বাধীনতা ও জাতীয় পরিচয়ের পুনরুদ্ধারের পক্ষে কথা বলেছেন। তবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেননি।

আহমদ শাওকীর সাহিত্যেও রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান ছিল, তবে তিনি প্রথমদিকে রাজতন্ত্রের স্তুতিতে কবিতা রচনা করলেও পরবর্তী সময়ে জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেন। তার কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্যের গুরুত্বের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে তিনি জাতীয় ঐক্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন সাধারণ জনগণের কণ্ঠস্বর। তিনি দরিদ্র জনগণের দুর্দশা, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শোষণ এবং শিক্ষার অভাব নিয়ে সোচ্চার ছিলেন। তার সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকাংশে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জাতীয় চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তবে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে স্পষ্ট কোনো মত দেননি।

মারুফ রুসাফী মূলত আধুনিকতাবাদী ছিলেন এবং তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতির প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তিনি আরব সমাজের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে তা সংস্কার করতে চেয়েছেন, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার বিরোধিতা করেছেন।

সুতরাং, রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে নাজীব আল-কিলানী ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার সবচেয়ে দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, যেখানে অন্য সাহিত্যিকরা মূলত জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে সাহিত্যচর্চা করেছেন।

সামাজিক চেতনা: মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্য সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তিনি ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের আহ্বান জানিয়েছেন। তার উপন্যাস "হাদিস আত-তিন" (ডুমুরের গল্প)-এ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, নারীর প্রতি অবিচার ও ইসলামী জীবনপদ্ধতির অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

অন্যদিকে, মাহমুদ সামী আল-বারুদীর সাহিত্য আরবদের গৌরবময় অতীত পুনরুদ্ধারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। তিনি আরব সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরলেও নৈতিক অবক্ষয়ের সমাধানে বিশেষভাবে ইসলামী মূল্যবোধের ওপর জোর দেননি।

আহমদ শাওকীর সাহিত্য মূলত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ। তিনি আরবি সাহিত্যের শৈল্পিক উৎকর্ষ সাধন করেছেন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে লিখেছেন। তবে তিনি

সামাজিক সংস্কারে ইসলামী নীতির পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন সমাজের নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর। তিনি দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক ও নারীদের দুর্দশা নিয়ে লিখেছেন এবং সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। তার কবিতায় ইসলামী মূল্যবোধের প্রতিফলন তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার আহ্বান ছিল স্পষ্ট।

মারুফ রুসাফী পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমর্থক ছিলেন। তিনি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকে পশ্চাদপদ বলে সমালোচনা করেছেন। তার সাহিত্য সমাজের দুর্বলতাকে চিহ্নিত করলেও পাশ্চাত্য জীবনধারা গ্রহণকে সমর্থন করেছিল।

সামাজিক মূল্যবোধের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নাজিব আল-কিলানী একমাত্র সাহিত্যিক যিনি স্পষ্টভাবে ইসলামী মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে সমাজের নৈতিক সংস্কারের কথা বলেছেন। অন্য সাহিত্যিকরা জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের দিকগুলো নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন।

নারী অধিকার ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

নারী অধিকার বিষয়ে নাজিব আল-কিলানী ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি নারীদের সম্মান ও স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন, তবে সেটি ইসলামী বিধানের আলোকে হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। তার উপন্যাসে নারীর চরিত্রগুলোকে মর্যাদাশীল ও সচেতন ব্যক্তিত্ব হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

অন্যদিকে, হাফিজ ইব্রাহীম নারীদের অধিকারের বিষয়ে সাহসী অবস্থান নিয়েছেন। তার কবিতায় নারীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আহমদ শাওকী ও মাহমুদ সামী আল-বারুদীর সাহিত্যেও নারীদের অধিকার নিয়ে আলোচনা আছে, তবে তা তুলনামূলকভাবে কম।

মারুফ রুসাফী পশ্চিমা ধাঁচের নারী স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন। তিনি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছিলেন এবং ইসলামী বিধিনিষেধকে রক্ষণশীল বলে মনে করতেন।

সুতরাং, নারীর অধিকারের বিষয়ে নাজিব আল-কিলানীর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলামী জীবনব্যবস্থার মধ্যে স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণের পক্ষে, যেখানে হাফিজ ইব্রাহীম ও মারুফ রুসাফী তুলনামূলকভাবে আরও উদার ছিলেন।

নাজীব আল-কিলানীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সামাজিক সংস্কার এবং সাংস্কৃতিক স্বাভাবিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, মাহমুদ সামী আল-বারুদী, আহমদ শাওকী, হাফিজ ইব্রাহীম ও মারুফ রুসাফী জাতীয়তাবাদ, আধুনিকতাবাদ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার আলোকে বিচার করলে নাজীব আল-কিলানী ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পক্ষে সবচেয়ে দৃঢ় অবস্থানে ছিলেন, যা তাকে অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় অনন্য করে তুলেছে।

৩. নৈতিক চরিত্র গঠনের শিক্ষা

উপরোক্ত সাহিত্যিকদের তুলনায় নাজিব আল কিলানী এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক, যিনি তাঁর সাহিত্যে কেবল নৈতিক চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্ব দেননি, বরং তিনি ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করেছেন। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলো কেবল নীতিকথার পাঠ্য নয়, বরং এগুলো বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, যেখানে চরিত্রগুলোর মাধ্যমে নৈতিকতা ও ইসলামিক চেতনার সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে।

১. ইসলামী মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধ অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পে নৈতিক চরিত্র গঠনের সাথে সাথে ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর উপন্যাস "আর রাসূলুল মুহতাকবাল" (ভবিষ্যতের রাসূল) নৈতিক শিক্ষা ও ইসলামী চেতনার এক অসাধারণ উদাহরণ।

২. বাস্তবধর্মী চরিত্রায়ণ

অন্যান্য সাহিত্যিকরা মূলত কাব্যিক ভাষায় নৈতিক শিক্ষাকে উপস্থাপন করলেও, নাজিব আল-কিলানী তাঁর উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্মে বাস্তব জীবনের সমস্যাগুলো তুলে ধরা হয়েছে এবং সে সমস্যার সমাধান ইসলামী শিক্ষার ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে।

৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য শুধু ব্যক্তি নৈতিকতার উপর জোর দেয় না, বরং সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের আহ্বান জানায়। তিনি মুসলিম উম্মাহর পতন ও পুনর্জাগরণের কারণগুলো তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

৪. উপন্যাস ও গল্পের মাধ্যমে প্রভাব

অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই কবিতার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছেন, কিন্তু নাজিব আল কিলানী তাঁর সাহিত্যকে উপন্যাস ও ছোটগল্পের মাধ্যমে সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য করেছেন। তাঁর গল্পগুলো জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিচ্ছবি এবং তা পাঠকদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে।

যদিও মাহমুদ সামী আল বারুদী, হাফিজ ইব্রাহীম, মারুফ রুসাফী এবং আহমদ শাওকীর মতো সাহিত্যিকরা নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, নাজিব আল কিলানী ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী। তাঁর সাহিত্যকর্ম কেবল নৈতিক শিক্ষার প্রচার করেনি, বরং তা বাস্তব জীবনে ইসলামী চেতনার আলোকে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে। তিনি শুধুমাত্র নৈতিক মূল্যবোধের প্রচারক ছিলেন না, বরং তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে বাস্তবধর্মী সমাধান উপস্থাপন করে মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। এই দিক থেকে তিনি নিঃসন্দেহে অনন্য এবং কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাহিত্য সমালোচকদের দৃষ্টিতে ড. নাজিব আল কিলানী

আধুনিক গবেষকরা নাজিব আল কিলানীকে একজন প্রভাবশালী সাহিত্যিক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যিনি সমকালীন আরবি সাহিত্যে গভীর প্রভাব ফেলেছেন। গবেষকদের মতে, নাজিব আল কিলানীর সাহিত্য তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশেষভাবে স্বীকৃত:

১. ইসলামী চেতনার প্রসার

নাজিব আল কিলানী তাঁর রচনার মাধ্যমে ইসলামী নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। গবেষকরা মনে করেন, তাঁর সাহিত্য কেবল ধর্মীয় উপদেশের জায়গা নয়, বরং এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বাস্তবধর্মী চিত্রায়ণ।

২. বাস্তবধর্মী সাহিত্যকর্ম

তাঁর উপন্যাস ও গল্পে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে, যা পাঠকদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। গবেষকদের মতে, নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যে সমাজের নানান সমস্যা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক দমননীতি ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্রায়ণ পাওয়া যায়।

৩. উপন্যাসে নৈতিকতা ও সমাজ সংস্কার

আধুনিক গবেষকরা মনে করেন, নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি সাহিত্যকে সমাজ সংস্কারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস "আর রাসূলুল মুহতাকবাল" (ভবিষ্যতের রাসূল) এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্মে নৈতিকতা ও সামাজিক পরিবর্তনের বার্তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এছাড়াও সাহিত্য সমালোচকগণ তার সাহিত্যকর্মের বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন, যেগুলো আধুনিক আরবী সাহিত্যে তার অবস্থানকে বিশেষায়িত করেছে। সেগুলো নিম্নরূপ:

১. নাজিব আল কিলানী ও উপনিবেশিকতাত্ত্বিক গবেষণা

গবেষক আয়দিন গোরমেজ ও আবদুল্লাহ সাদ্দের মতে, নাজিব আল কিলানী একজন পোস্টকলোনিয়াল লেখক, যিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে উপনিবেশবাদ ও পশ্চিমা আধিপত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তাঁর "Turkistan Nights" এবং "Napoleon in Al-Azhar" উপন্যাস দুটি উপনিবেশবাদবিরোধী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গবেষকদের মতে, তিনি আরব-আফ্রিকান সাহিত্যে উপনিবেশবাদের প্রভাব তুলে ধরেছেন এবং মুসলিম বিশ্বের সংগ্রামের চিত্রায়ণ করেছেন।

২. ইসলামী সাহিত্যের বিকাশে অবদান

গবেষকরা নাজিব আল কিলানীকে আধুনিক ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁদের মতে, তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্যকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন এবং সাহিত্যে ইসলামী মূল্যবোধের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছেন।

৩. ভাষাশৈলী ও সাহিত্যগুণ

গবেষকদের অনেকেই নাজিব আল কিলানীর ভাষার সরলতা এবং প্রাঞ্জলতাকে তাঁর সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখেন। তাঁর রচনা জটিল সাহিত্যিক গঠনের চেয়ে সহজবোধ্য হলেও তা গভীর অর্থবহ এবং চিন্তা উদ্দীপক।

৪. সাহিত্য ও বাস্তবতার সংযোগ

বিভিন্ন গবেষক তাঁর সাহিত্যকে বাস্তবধর্মী সমাজচিত্র হিসেবে বিবেচনা করেন। তাঁর উপন্যাসগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ইসলামী সমাজের দ্বন্দ্ব এবং মানবিক মূল্যবোধের সংঘাত গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৫. নারীচরিত্রের চিত্রায়ণ

গবেষকদের মতে, নাজিব আল কিলানী তাঁর সাহিত্যকর্মে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত যত্নের সাথে তুলে ধরেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলোতে নারীচরিত্রের সংগ্রাম, তাদের অধিকার, সামাজিক ও পারিবারিক দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো অত্যন্ত বাস্তবধর্মীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

৬. রাজনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

গবেষকরা মনে করেন, নাজিব আল কিলানীর সাহিত্যকর্ম রাজনৈতিক এবং আদর্শিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে উপনিবেশবাদ, স্বৈরাচার এবং সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে শক্তিশালী বার্তা দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

৭. সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিকতা

গবেষকরা বিশ্বাস করেন যে, নাজিব আল কিলানীর সাহিত্য এখনও সমসাময়িক এবং প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখাগুলো বর্তমান সময়ের সমাজ ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর প্রতিফলন করে, যা পাঠকদের মধ্যে গভীর চিন্তা ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ করে দেয়।

আধুনিক গবেষকদের দৃষ্টিতে নাজিব আল কিলানী এক ব্যতিক্রমী সাহিত্যিক, যিনি ইসলামী মূল্যবোধ, সমাজ সংস্কার এবং রাজনৈতিক সচেতনতার সমন্বয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। গবেষক আয়দিন গোরমেজ ও আবদুল্লাহ সাঈদের মতে, তিনি উপনিবেশবাদবিরোধী সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন এবং ইসলামী আদর্শ ও সামাজিক বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য নয়, বরং এটি সমাজের নৈতিক উন্নতির এক শক্তিশালী মাধ্যম। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলো সময়ের সাথে সাথে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, যা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা এবং দূরদর্শিতার প্রমাণ বহন করে।

উপসংহার

ড. নাজিব আল-কিলানী ইসলামী সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ, যিনি সাহিত্যকে কেবল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি, বরং একে ইসলামী আদর্শ, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনৈতিক চেতনা, এবং মানবিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম মুসলিম উম্মাহর চেতনা জাগরণ, সমাজ সংস্কার এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলেছে। এ গবেষণার মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যের নানাদিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, ইসলামি শিক্ষার প্রতি অবদান, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা, এবং অন্যান্য আধুনিক আরবি সাহিত্যিকদের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য দর্শন ইসলামের মৌলিক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলোতে ইসলামী আদর্শ, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চিত্র উঠে এসেছে। তিনি সাহিত্যকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি সমাজ সংস্কার ও চেতনা জাগরণের হাতিয়ার হিসেবে দেখেছেন।

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য সমাজের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষার জন্য এক অবিচল প্রচেষ্টা। তাঁর অনেক সাহিত্যকর্মে সমাজের অবক্ষয়, পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, এবং মুসলিমদের আত্মপরিচয়ের সংকট ফুটে উঠেছে। নারী অধিকার, পারিবারিক বন্ধন এবং যুবসমাজের নৈতিক সংকট তাঁর লেখনীতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাশ্চাত্য সাহিত্য যেখানে নারীকে মুক্তির নামে ভোগ্যপণ্য হিসেবে তুলে ধরে, সেখানে নাজিব আল-কিলানী নারীদের ইসলামী আদর্শের আলোকে সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

নাজিব আল-কিলানী যিনি রাজনীতির সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সাহিত্যে ইসলামী পুনর্জাগরণের প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন উপন্যাসে তিনি মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক সংকট, ঔপনিবেশিক শোষণ, এবং শাসকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। উপন্যাসে তিনি পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতিরোধের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা এবং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সাহিত্যে নির্যাতিত মুসলিম জনগণের কষ্ট ও সংগ্রামের চিত্র তুলে ধরেছে, যা আজও প্রাসঙ্গিক।

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য ও গবেষণা ইসলামী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, বরং এটি নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই তাঁর রচনাগুলোর মূল লক্ষ্য ছিল একটি সুসজ্জল ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার একচোখা নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্যতা তুলে ধরেছেন। তাঁর লেখায় আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ইসলামী নীতিশিক্ষার সমন্বয়ের আহ্বান লক্ষ্য করা যায়।

নাজিব আল-কিলানী পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাবের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁর সাহিত্য পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির তীব্র সমালোচনা করেছে। তিনি পাশ্চাত্যের ভোগবাদী জীবনধারার পরিবর্তে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ন্যায় ও কল্যাণমূলক দিকগুলো তুলে ধরেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা বাহ্যিক উন্নয়ন আনতে পারলেও এটি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক সংকট নিরসনে ব্যর্থ। তাঁর সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিপরীতে এক শক্তিশালী ইসলামী চেতনার জন্ম দেয়।

নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য আজও সমান প্রাসঙ্গিক। মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক সংকট, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এবং নৈতিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্য নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আধুনিক সাহিত্যিকরা তাঁর রচনাগুলো থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ইসলামী মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করতে পারেন।

বিশ্বায়নের যুগে মুসলিম উম্মাহ যখন সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের শিকার, তখন নাজিব আল-কিলানীর সাহিত্য আমাদের সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও আদর্শ রক্ষার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর সাহিত্য শুধু ইতিহাস নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর ভবিষ্যৎ পথচলার দিকনির্দেশক। তাঁর সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর আত্মপরিচয়, সামাজিক সংস্কার, রাজনৈতিক মুক্তি, এবং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের এক অনন্য দলিল। তাঁর রচনা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় উপাদান।

তাঁর সাহিত্যকর্ম অধ্যয়ন, প্রচার, ও গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ হবে এবং মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জাগরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থপঞ্জী

কুরআন ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ

১. আল কুরআনুল কারীম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ছত্রিশতম মুদ্রণ, ২০০৭।
২. আলুসী, শিহাবউদ্দীন মাহবুব ইবনু আদিল্লাহ, *রুহুল মা'আনী ফি তাফসীরিল কুরআনিল আযীম ওয়াস সাব'ইল মাছানী*, বৈরুত: মুয়াসসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩১ হিজরী/ ২০১০ ঈসায়ী।
৩. রাযী, ফখরুদ্দীন, *মাফাতীহুল গাইব (তাফসীরে কাবির)*, বৈরুত: দারুল ফিকর, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ ঈসায়ী।
৪. আল-কুরতুবী, আবু আদিল্লাহ মুহাম্মদ, *আল জামিউ লিল আহকামিল কুরআন*, বৈরুত: দারুল ইহইয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, ১৯৮৫।
৫. ইবন কাছির, ইসমাইল ইবনে 'উমর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, সৌদি আরব: দারুত তাইয়্যাবাহ, ১৪২০ হিজরী।
৬. আস-সুয়ুতী, জালালউদ্দীন, *আদ দুররুল মানসূর ফিত তাফসীর বিল মাছুর*, বৈরুত: ১৯৯৩।
৭. আত-তাবারী, আবু জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, *জামিউল বায়ান*, বৈরুত, দারুল ফিকর, ১৪০৫ হি।
৮. (মূল) ইবনু কাছির, আবুল ফিদা হাফিজ ইসমাইল ইবনু উমর, (অনুবাদ) ফারুক, আখতার, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০১১।
৯. (মূল) শফী, মুফতী মুহাম্মদ, (অনুবাদ) খান, মুহিউদ্দীন, *তফসীরে মা'আরিফুল কুরআন*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩শ সংস্করণ, ২০০৯।
১০. (মূল) পানিপথী, কাজী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ, (অনুবাদ) সম্পাদনা পরিষদ, *তাফসীরে মাজহারী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭।
১১. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ, *সরল রীতির কুরআন শরীফ (বাংলা অর্থসহ)*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ২০১৩।
১২. (মূল) বুখারী, আবু আদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, (অনুবাদ) সম্পাদনা পরিষদ, *আল জামিউস সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১০ম সংস্করণ, ২০১৭।

১৩. (মূল) ইবনুল হাজ্জাজ, আবুল হুসাইন মুসলিম, *আস সহীহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, ২০১০।
১৪. আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ, *আস সুনান*, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রাইয়ান, ১৪১৯ হিজরী/১৯৯৮ ঈসায়ী।
১৫. আসকালানী, ইবনে হাজার, *ফাতহুল বারী*, বৈরুত: দারুল রিসালাতুল আলামিয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরী/২০১৩ ঈসায়ী।

আরবী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ

১৬. শাওকী, আহমদ, *আশ-শাওকীয়াত*, কায়রো: মুয়াসসাসাতু হিনদাভী লিত তা'লিমী ওয়াস ছাক্বাফাহ, ২০১২।
১৭. ইবনে আতিয়া, জারীর, *দীওয়ানু জারীর*, মিসর: আল মাতবাতুল ইসলামিয়াহ, ১৩১৩ হিজরী।
১৮. দ্বইফ, শাওকী, *আল আদাবুল আরাবিয়্যিল মু'আসির ফি মিসর*, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১০ম সংস্করণ, ২০১০।
১৯. বারগিশ, মুহাম্মদ হাসান, *ফিল আদাবিল আরাবিয়্যিল মু'আসির; দিরাসাহ ও তাত্ববিক্ব*, জর্ডান: মাকতাবাতুল মানার, ১৯৮৫।
২০. আল-ফাখুরী, হান্না, *আল জামি ফি তারিখিল আদাবিল আরাবী- আল আদাবুল হাদীস*, (বৈরুত: দারুল জিল, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬।
২১. আল-ফাখুরী, হান্না, *তারিখুল আদাবিল আরাবী*, (বৈরুত: আল মাতবাতুল বুলুসিয়াহ, ১৯৫৩।
২২. যায়দান, জুরজী, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়াহ*, মিসর: মাতবাতুল হিলাল, ১৯১১।
২৩. আল হামাবী, ইয়াকুত, *মুজামুল উদাবা*, মিসর: মাতবাতুল হিনদিয়াহ, ১৯৩০।
২৪. আন-নাশাশী, মুহাম্মদ আস'আফ, *আল আরাবিয়াহ ওয়া শা'ইরুহাল আকবার আহমাদ শাওকী*, কায়রো: মাতবাতুল মা'আরিফ, ১৩৪৬ হিজরী/১৯২৮ ঈসায়ী।
২৫. হুসাইন, ত্বহা, *হাফিজ ওয়া শাওকী*, কায়রো: মাতবাতুল ই'তিমাদ, ১৩৪৩ হিজরী/১৯২৩ ঈসায়ী।
২৬. হুসাইন, ত্বহা, *ফিশ শি'রিল জাহিলী*, কায়রো: ফারুক মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, ১৯৩১।

২৭. কিলানী, নাজীব, *শাওকী ফি রাকবিল খালিদিন*, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরী/১৯৮৯ ঈসাব্দী।
২৮. যাইয়্যাত, আহমদ হাসান, *তারিখুল আদাবিল আরাবি*, বৈরুত: দারুশ শারকীল আরাবী, ২০০৬।
২৯. দ্বইফ, শাওকী, *শাওকী: শা'ইরুল আসরিল হাদীস*, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ১২শ সংস্করণ, ১৯৫৩।
৩০. তুরাইফী, ইউসুফ আতা, *আমিরুস শুয়ারা আহমদ শাওকী: হায়াতুহ ওয়া শি'রুহ*, আম্মান: আল আহলিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওযি, প্রথম সংস্করণ, ২০০৯।
৩১. ইবনে রাশীক আল কাইরাওয়ানী, *আল 'উমদাহ ফি মাহাসিনিস শি'রী ও আদাবিহি*, বৈরুত: দারুল জিল, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮১।
৩২. আল জাহিয়, *আল বায়ান ও ওয়াত তাবয়ীন*, কায়রো: মাকতাবাতুল খানজী, ৭ম সংস্করণ, ২০০৮।
৩৩. আল-জুমাহী, ইবনু সাল্লাম, *তাবাকাতুশ শুয়ারা*, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২০০১।
৩৪. হাসান, আব্বাস, *আল মুতানাক্বী ওয়া শাওকী*, কায়রো: দারুল মা'আরিফ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৩।
৩৫. আল-ইবইয়ারী, ইবরামীম, *আল মাউসু'আতুস শাওকীয়াহ*, বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরাবি, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৮।
৩৬. আল জুনদী, আনওয়ার, *আদ্বওয়াউন 'আলাল আদাবিল আরাবিয়্যিল মু'আসির*, কায়রো: দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৯৬৮।
৩৭. কাক্বিশ, আহমদ, *ফি তারিখিশ শি'রিল আরাবিয়্যিল হাদীস*, বৈরুত: দারুল জীল, তা.বি.।
৩৮. মুসলেহ উদ্দীন, আবু তাহির মুহাম্মদ, *আরবী সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৯৫।
৩৯. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ আল আওয়াদ, *আশ-শি'রুল আন্দালুসী*, রিয়াদ: মাতাবি'উ বাহরিল উলুম, ১৯৮২।
৪০. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ, *আরব মনীষা*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩।
৪১. আব্দুস সালাম, ড. এস. এম., *আরবী সাহিত্য প্রতিভা*, রাজশাহী: সালেহা পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০২০।
৪২. Julie Scott Meisami and Paul Starkey, *Encyclopedia of Arabic Literature*. London:

Routledge, reprint, 1999.

৪৩. Paul Starkey, *Modern Arabic Literature*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
৪৪. Reynold Alleyne Nicholson, *A Literary History of the Arabs*. Glasgow: Good press, 2019.
৪৫. Badawi, Mohammed Mustafa, *A Short History of Modern Arabic Literature*, UK: Oxford University Press. 1993.
৪৬. Ghirbal, Mohammed, *Al-Mauso'a al-Arabiya al-Muyassarrah [Simplified Arabic Encyclopedia]*, Egypt: Franklin Institution for Publishing. 1965.
৪৭. Al-Musawi, Muhsin J., *Islam on the street: Religion in modern Arabic Literature*, Plymouth: Rowman and littlefield Publishers. 2011.
৪৮. Haywood, Jhon A., *Modern Arabic Literature (1800-1970)*, London: Lund Humphries, 1971.
৪৯. Ahmed, A., *In Theory: Classes, Nations, Literature*, Bombay, Calcutta, Madras, Delhi: Oxford University Press, 1994.
৫০. Al-Kilani, N., *The Enemies of Islam*, Cairo: The Foundation of the Message, 1981.
৫১. Al-Kilani, N., *Turkistan Nights*, Cairo: Alsahoh, 2015.
৫২. Allen, R., *The Arabic Novel: A Historical and Critical Introduction*, New York: Syracuse University Press, 1982.
৫৩. Al-Qau'd, H. M., *Islamic Reality in the Novels of Najib Al-Kilai*, Cairo: Dar Al-Abikan, 1994.
৫৪. Fanon, F., *A Dying Colonialism*, (M. R. Press, Trans.) New York, United States of America: Grove Press, 1965.
৫৫. Mohammed Bin Ahmed, A. A.-H., *Post-Colonial Discourse in Literature*, Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia (IIUM), 2016.

৫৬. Suasha, S. B., *The Formation of The Place Structure in The Convoys of Freedom Novel*, Masila: The University of Mohammed Bu Zhiyaf, 2015.
৫৭. Giv, Ahmad Lamei & Mohaghegh Nia, Marziye, *The Status of Women in the Novels of Najib Al-Kilani (Based on Two Novels of Jakarta's Virgin and The Man Who Believed)*, Theory and Practice in Language Studies, Vol. 6, No. 6, June 2016, pp. 1315-1322.

অন্যান্য গ্রন্থ

৫৮. তালিব, আবদুল মান্নান, *ইসলামী সাহিত্য: মূল্যবোধ ও উপাদান*, ঢাকা: বাংলা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৭।
৫৯. আহমদ, এ. কে. এম. নাজির, *ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০৫।
৬০. আব্দুর রহীম, মাওলানা, *শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, চতুর্থ প্রকাশ, ২০০৬।
৬১. মুজিবুর রহমান, মোহাম্মদ, *শিক্ষার দার্শনিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি*, ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরি, প্রথম সংস্করণ, ২০১১।
৬২. খান, আব্দুল আউয়াল ও অন্যান্য, *শিক্ষার ভিত্তি*, ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স, ১৯৯৮।
৬৩. অধ্যাপক ঘোষ ও অধ্যাপক রায়, *শিক্ষা বিজ্ঞান*, কলিকাতা: ব্যানার্জী পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৭।
৬৪. ড. আবদুল ওয়াহিদ, *বাংলাদেশ ইসলামী শিক্ষা প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, ঢাকা : ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিষদ, ২০০১।
৬৫. নাসিম, আব্দুস শহীদ, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, ২য় প্রকাশ, ২০১৪।

আরবী, ইংরেজি ও বাংলা অভিধান

৬৬. ইবনে মানযূর, *লিসানুল আরব*, বৈরুত: দারু সাদির, ২০১০।
৬৭. আল-আযহারী, মুহাম্মদ আলাউদ্দীন, *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।
৬৮. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ, *আল মু'জামুল ওয়াফী*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ৪৭তম সংস্করণ, ২০২৩।
৬৯. ফজলুর রহমান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ, *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ২০০৩।
৭০. শরীফ, আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১১শ সংস্করণ, ২০১৫।
৭১. মুস্তাফা, ইবরাহীম ও অন্যান্য, *আল মু'জামুল ওয়াসীত*, কায়রো: দারুদ দাওয়াহ, তা.বি.
৭২. রুহুল বা'আলবাক্কী ও মুনীর বা'আলবাক্কী, *আল মাওরিদ*, বৈরুত: দারুল 'ইলমী লিল মালায়িন, ২০০৭।
৭৩. অনলাইনভিত্তিক আরবী অভিধান, *মু'জামুল মা'আনী*, www.almaany.com/

গবেষণা অভিসন্দর্ভ ও নিবন্ধ

৭৪. আব্দুল্লাহ, আবু সাইদ মো.: *কাজী নজরুল ইসলাম ও হাফিজ ইবরাহীমের কবিতায় ইসলামী উপাদান: তুলনামূলক পর্যালোচনা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২।
৭৫. মাহফুজুল করিম, মো.: *আধুনিক আরবী কবিতায় রেনেসাঁর গতিধারা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২।
৭৬. সোলায়মান, মোহাম্মদ, *আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
৭৭. রহিম উল্যাহ, মো.: *আব্বাসী যুগের আরবী কবিতার ভাব ও গঠন বৈশিষ্ট্য*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।
৭৮. মঞ্জুরুল ইসলাম, মো.: *আলী (রা:) এর কাব্যে প্রাপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার বিশ্লেষণ*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩।
৭৯. রুহুল আমীন, মুহাম্মদ, *আহমদ শাওকী বিরচিত শিশুসাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
৮০. আহমদ, মোহাম্মদ দাউদ, *স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইবনে যায়দুন*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯।
৮১. আব্দুর রহিম, আবু নোমান মো.: *আরবী ভাষা ও সাহিত্যে আল কোরআন ও আল হাদীসের প্রভাব*, (৬১০-৭৫০খ.), আহমদ, মোহাম্মদ দাউদ, *স্পেনীয় আরবী কবিতা ও ইবনে যায়দুন*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
৮২. নুরুল আমিন, মো.: *আহমদ শাওকী ও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ চিন্তা: একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০।
৮৩. কামরুল হাসান, মো.: *খুলাফা রাশিদুন (রা:) এর সাহিত্য সাধনা*, পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫।
৮৪. উম্মে হানী, খোন্দকার নূরুল একা, *মুসলিম স্পেনের আরবী সাহিত্য: প্রকরণ ও শৈলী*, এম.ফিল.

- অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।
৮৫. রবিউল হক, মোহাম্মদ, *হাফিজ ইবরাহীমের কবিতায় আলমারাসী (শোকগাঁথা): একটি পর্যালোচনা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮।
৮৬. আলম, মো: জাহাঙ্গীর, *ইসলামী দাওয়া বিষয়ক আরবী কাব্যের ক্রমবিকাশ: হাসসান বিন ছাবিত ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ - এর কাব্যচর্চা*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৭।
৮৭. শাহান, আতউর রহমান, *আব্বাসী যুগে আরবী অলংকার শাস্ত্রের বিকাশ*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৯।
৮৮. হেলাল উদ্দীন, *উমাইয়া আমলের নাক্বাইদ সাহিত্য: প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য*, এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২।
৮৯. সাজিদুল হক, ড. মো:, *আহমদ শাওকীর সাহিত্যকর্ম, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন*, নিবন্ধ, গবেষণা পত্রিকা (কলা অনুষদ), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা-২৭, জুন-২০১৯।
৯০. Coovadia, Shaheed, *The life and poetry of Ahmad Shawqi: A critical study and reappraisal*, Ph.D. Thesis, Department of Middle Eastern Studies, University of Manchester, 1999.
৯১. Raudlotul Firdaus, Dr. and Shah Jani, Dr. Mohd, *Islamic Education: The Philosophy, Aim, and Main Features*. International Journal of Education and Research. Vol. 1 No. 10 October 2013.
৯২. Al Azhari, Sanaullah, *The Concept of Islamic Literature and Islamization of Literature through the Different ages*, Journal of Islamic and Religious studies, Vol. 2, No. 2, 2017.
৯৩. M. M. Badawi, *Islam in Modern Egyptian Literature*, Journal of Arabic Literature, Liden: brill publication, 1971.

অনলাইনভিত্তিক উৎস

- ৯৪. www.brill.com
- ৯৫. www.adab.com
- ৯৬. www.archive.org
- ৯৭. www.britannica.com